আকাশলীনা

উত্তর আমেরিকা প্রবাসী বাঙালি কবি ও লেখকদের
কবিতা, ছোটগল্প ও প্রবন্ধ সংকলন

কামরুন জিনিয়া সম্পাদিত

আকাশলীনা | কামরুন জিনিয়া সম্পাদিত

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়	কামরুন জিনিয়া
লিসা, তুমি কেমন আছ?	অমল মিত্র
বিদ্রোহী কলম	আমিনুর রশীদ পিন্টু
নামহীন ছড়া	আনসারী খান
স্মৃতির বাঁকে	আতিকুর রহমান
নন্দিনী	
দৃষ্টির কারাগাওে	বিমল কান্তি পাল
তুমিই তো তুমিও তো	বদিউজ্জামান নাসিম
জংলী ফুলের সুগন্ধ	দলিলুর রহমান
বিমূর্ত্ত শব্দগুলো	দেওয়ান সৈয়দ আবদুল মজিদ
হীরক এবং জ্যোতির আর্কেটাইপ সংস্কৃতিতে বাংলাদেশ	দেওয়ান শামসুল আরেফীন
শাখা মৃগের মৃগয়া	দিলারা হাশেম
জটিল মানুষ ও দীর্ণ প্রতিবেশ	ডঃ আলী রীয়াজ
পাশে রেখে আংশিক আঁধার	ফকির ইলিয়াস
বহুগামী সূর্যরেখা	
খেয়াকথা	
অনার্য শরত	
নীলের নিখিল	
উত্থান সব গিয়েছে উজানে	ফারহানা ইলিয়াস তুলি
ফ্যাশনে সূর্যাস্তের দৃশ্য	
অন্নবতী নবান্ন নীলিমা	ফেরদৌস নাহার
প্রাচ্য তোমাকে গুডবাই....	
নাবিক	
মোমার্তের বাতাস কাঁপছে	
ভাষা হয় ভালবাসার গল্প	ফেরদৌস জেসমীন
দু'হাতে আঁধার কেটে	
অন্তরাল	গুলশান আরা কাজী
মন্দ্র সপ্তক	হায়দার খান
আত্মপ্রতিকৃতি দেখে নিউইয়র্ক লন্ডন বার্লিনে	
স্মৃতির পাতায় নজরুল	হারুণ চৌধুরী
সতেরো নম্বরে বাংলাদেশ	হাসান ফেরদৌস
পুনরায় কোনো এক নক্ষত্র	হাসান আল আব্দুল্লাহ

সুরক্ষিত দুর্গের প্রত্যাশায়	হেলেনা খান
চোখ	হোমায়রা আহমেদ
সে আর ফেরে না	ইকবাল হাসান
যখন ডেকেছ তুমি	
সন্ধ্যার তৈলচিত্র	
জ্বলে চাঁদ জলের অতলে	
দুঃখ-কষ্টের গল্প	ইকবাল হাসান
লীলাবতী	জাহানারা খান বীণা
সম্পর্ক নির্মাণের মুহূর্ত	জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত
শবশোভাযাত্রা	
মেম সাহেব	কমলকলি
গল্প নয়	কেতকী কুশারী ডাইসন
রম্য কাহিনী	লিয়াকত হুসেন আবু
প্রেম	
প্রবাস প্রবাঁশ	লুৎফর রহমান রিটন
জীবন রহস্য	মাসুদুল আবেদ
বেঁচে থাকার মন্ত্র	মিনা ফারাহ
ইষ্টের বিশ্বায়ন, না অনিষ্টের?	মীজান রহমান
হঠাৎ কখনো	মনি মোজাম্মেল
মাতৃদিবস	মনিরা বেগম
************	
হে অনিন্দিতা বন্ধু	মুকতাদীর চৌধুরী তরুণ
রঙধনুর আরেকটি রঙ	মুনীর মুজতবা আলী
ঝুমকো লতা	মুসাররাত জাহান শ্বেতা
ভালোবাসা ও ঘৃণা	নাসরিন চৌধুরী
ধূম্রজাল	নাসরীন খান রুমা
একুশের ভাবনা/আমাদের সীমিত ভূমিকা	নাজমা খান
বড়ো বাজার	নাজনীন সীমন
বিজয়ের সংকেত	নূরুন নবী
তসলিমা নাসরিন ক-থা অমৃতসমান?	পার্থ ব্যানার্জী
অবিনাশী যাত্রা	পূরবী বসু
‘লারা’-র স্বপ্ন দেখো কি করে আকাশ ছোঁয়	কামরুন জিনিয়া
আপনার স্বপ্নভঙ্গের জন্যে দুঃখিত	
এই শহরে একটা কোনো বিকেল মানেই	রবিউল হাসান
না দেবী না মানবী	
ভাষা দিবস ও নতুন প্রজন্মের বাংলা চর্চা	রানু ফেরদৌস
সারা পৃথিবী	রেজাউর রহমান
সেই নারী	
মৃত প্রজাপতি	রোকসানা লেইস
এক্স-রে প্লেটে অচেনা প্রজন্ম	রুকসানা রূপা
বিত্তবিচ্ছেদ	
একুশের চেতনা	সাহেরা আফজা

ঢেউ	সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল
সন্ধ্যার বন্ধুরা	
অতঃপর প্রেম ও নির্বাসনের কবিতা......	শাহেদ ইশবাল
অসহায়	
বাচ্চাদের সফটওয়্যার	শামীম তুষার
স্মিথতিল মেথোডিস্ট চার্চে	অনুবাদ: শামস আল মমীন
স্টেফেন ডান	
বাদামি বৃত্ত	
লুইজ গ্লিক	
ঈভ্ এর আলোচনার অংশবিশেষ	
মেরী হাও	
মৃত্যু শেষ দেখা	
মেরী হাও	
আমার জন্যে তোমার, তোমার জন্যে আমার	শামসুল হুদা
যদি	
বিজয়ের মাস–নতুন প্রত্যয়ের মাস	বাঙালী শামসুর রহমান
একজন রাজনীতিক তাজউদ্দিনের প্রেম দ্বিতীয় পর্ব	শারমিন আহমেদ
শুকনো ঘাসের শূন্য বনে	শবনম আমীর
পরবাস	সোহেলী সুলতানা
বশ্বাস আর ভালোবাসার টাওয়ার	
সেই ছেলেবেলা	সুলতান পারভেজ
দেখা	সুরাইয়া খানম
ছেঁড়া শাড়ি	
চন্দ্রমেহন	
অন্য কথা	
শুশ্রুবাগার	
শব্দরথী	
সাহিত্য ও সংস্কৃতি নিয়েই বাঙালী	সাঈদ-উর-রব
বই পরিচিতি ঃ আকাশলীনা (২০০৫) (উত্তর আমেরিকা প্রবাসী কবি ও লেখকদের কবিতা, প্রবন্ধ ও ছোটগল্প সংকলন)	মোহাম্মদ জাহিদ হোসেন

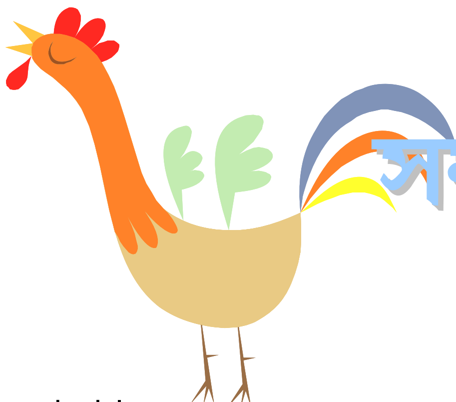

সম্পাদকীয়

www.akshleena.net

‘আকাশলীনা’ উত্তর আমেরিকা প্রবাসী বাঙালী কবি ও লেখকদের একটি বাৎসরিক কবিতা, ছোটগল্প ও প্রবন্ধের সংকলন। প্রথম সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়েছিলো ২০০১ সালে, বাংলা ১৪০৮, পহেলা বৈশাখে। ২০০৫ সাল পর্যন্ত ‘আকাশলীনা’র পাঁচটি সংখ্যাই উত্তর আমেরিকাতে প্রকাশিত হয়। এ বছর ২০০৬ সালে ‘আকাশলীনা’র ষষ্ঠ সংখ্যাটি প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ থেকে বই আকারে ‘বাংলা নববর্ষ-১৪১৩’ তে প্রকাশিত হচ্ছে বলে আমি খুবই আনন্দিত। স্বরব্যাঞ্জন-এর কর্ণধার কবি ও লেখক শ্রদ্ধেয় সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলালকে আমার নিরন্তর শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা বইটি প্রকাশে তাঁর সার্বিক সহায়তার জন্যে।

উত্তর আমেরিকাতে আজ বহু বাঙালীর বাস। শুধু এখানে কোনো, বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে আজ ছড়িয়ে পড়েছে বাঙালীরা। এই ছড়িয়ে পড়ার পেছনে সামনের টান এবং পেছনের ধাক্কা দু'টোই কাজ করেছে। আজ থেকে এক দশক আগে যা কল্পনা করা যেতো না, এখন তাই সম্ভব হচ্ছে। অভিবাসী জনসংখ্যার সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড। অভিবাস জীবনের সকল প্রতিকুলতাকে অতিক্রম শুধু নয়, তীব্র প্রতিযোগিতাও করছেন বাংলাদেশীরা। তথ্য-প্রযুক্তির এই বিস্ময়কর সময়ে সারা পৃথিবী হঠাৎ করে ছোট হয়ে এসেছে। দূরত্ব আর দূরত্ব নয়, দেশের সীমানা এখন একটি আনুষ্ঠানিকতার মতো।

বাংলাদেশ দরিদ্রতম দেশগুলোর একটি। কিন্তু আমাদের হাজার বছরের বাঙালী সংস্কৃতি দরিদ্রতম নয়। সারা বিশ্বের সাথে যদি আমরা তুলনা করি তাহলে বাঙালী সংস্কৃতি কিন্তু খুবই উঁচুতে। অর্থ ও সংস্কৃতি এক সূত্রে বাঁধা নয়। আমাদের একটি বড়ো ঐতিহ্য আছে, বড়ো সংস্কৃতি আছে, ধর্ম-নিরপেক্ষতা আছে। আমাদের এই সংস্কৃতি সারা পৃথিবীতে বাঁচিয়ে রাখা প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে প্রবাসী বাঙালীদের ভূমিকা এবং দায়িত্ব অনেক। আমাদের যে উৎস সেই উৎসের সংস্কৃতির সাথে সকল প্রবাসী বাঙালীদের উচিত নিজেদেরকে বহমান রেখে দেওয়া। গত ছয় বছরে ‘আকাশলীনা’র সংখ্যাগুলো নিয়ে কাজ করতে যেয়ে আমি অনুভব করেছি, বলা যায় আমার বিশ্বাস জন্মেছে যে, প্রবাসী কবি ও লেখকরা কোনো অংশে পিছিয়ে নন–তাঁরা প্রচন্ড ভালো লিখছেন। পাঠকরা তা আরও ভালো বিচার করতে পারবেন। এখন খুব প্রয়োজন প্রবাসে বাংলা

সাহিত্য ও সংস্কৃতির একটি সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল গড়ে তোলা--বাঙালী সংস্কৃতিকে সঞ্জীবিত রাখা। এখানে, এই প্রবাসে, আমাদের একটি সমাজ তৈরি হয়ে গেছে। সেই আমাদের আশা-প্রত্যাশা আছে, প্রাপ্তির আনন্দ আছে, না-পাওয়ার হতাশা আছে, আছে স্বপ্ন, ভালোবাসা, লক্ষ্য আর সর্বোপরি প্রবাসের কঠিন জীবন-সংগ্রাম। নিরন্তর একটি সংস্কৃতির মেধা-মননের চর্চা করার মতো যদি একটি গোষ্ঠী বা পরিমন্ডল গড়ে না ওঠে, তাহলে তো যা কিছু অর্জন পরে সবটাই ধীরে ধীরে দূর্বল হয়ে যাবে। প্রবাসে এখন এতো ভালো লেখক, কবি, মেধাবী মানুষ আছেন যে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মতো ঘটনা বা সাংস্কৃতিক গতিশীলতা সম্প্রাণ হয়ে থাকতে পারে--'আকাশলীনা' সাহিত্য সংকলনটি সে ধরনেরই একটি বোধ, আবেগ, ইচ্ছা বা স্বপ্নের ক্ষুদ্র প্রয়াসমাত্র।

নিরন্তর ধন্যবাদ সকল প্রবাসী কবি ও লেখকদের, কাছের ও দূরের, যাঁরা শত ব্যস্ততার মাঝেও প্রবাসের এ যান্ত্রিক জীবনে লেখা পাঠিয়েছেন মনে করে, ভালোবেসে, বড়ো যত্ন করে--সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ। সংকলনটিতে লেখাগুলো লেখক ও কবিদের নামের বাংলা আদ্যক্ষর অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, অন্য কোনো মানদন্ডে নয়। আমার বিশ্বাস, লেখাগুলো আপনাদের ভালো লাগবে। সব না হলেও অন্ততঃ একটি লেখাও যদি কারো ভালো লাগে, আমি আমার এ পরিশ্রম ও ক্ষুদ্র প্রয়াসকে সফলতা মনে করবো।

ধন্যবাদ ও আমার আন্তরিক অভিনন্দন 'আকাশলীনা'র পৃষ্ঠপোষকতায় এবার যাঁরা ছিলেন, যাঁদের সহযোগিতার হাত প্রসারিত না হলে 'বাংলা নববর্ষে' বইটি প্রকাশ করা কঠিনই হতো। আমি কৃতজ্ঞ আপনাদের প্রতি। আপনাদের সহযোগিতা আমার অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে।

শেষে শুধু বলবো, একটি জাতির পরিচয় তার সংস্কৃতিতে। আর যুগ যুগ, শতবর্ষ ধরে যে সংস্কৃতির বীজ আমরা বহন করছি, তা শত বাধা-বিপত্তিতেও উপ্ত রয়ে যাবে আমাদের মনে--এই প্রবাসে, বা অন্য কোনোখানে, যতো দূরেই থাকিনা কেনো, সেই শেকড়ের সাথে সংযোগ যেনো কখনোই বিচ্ছিন্ন না হয়ে পড়ে--এই হোক প্রত্যয়!

সবাইকে নিরন্তর শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা।

কামরুন জিনিয়া
নিউ অরলিন্স, লুইজিয়ানা।
ইউ,এস,এ
১৪ই এপ্রিল, ২০০৬
১লা বৈশাখ, ১৪১৩

লিসা, তুমি কেমন আছ?

অমল মিত্র

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে যারা সরাসরি অস্ত্র নিয়ে মাঠে নামার সুযোগ পাননি, কিংবা অস্ত্র নিয়ে সম্মুখ সমরে যুদ্ধ করার মতো সাহস যাদের হয়নি, আমি তাদেরই একজন। আমার মতো নাম-না-জানা অনেকে যুদ্ধকালীন দীর্ঘ নয় মাস গ্রামে গঞ্জে আত্মগোপন করে যেভাবে বেঁচে ছিলেন, তাদের কথা ইতিহাসে খুব বেশি লেখা হয়নি। তাদের হয়ে আমি আমার অভিজ্ঞতার খণ্ড খণ্ড কিছু চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করছি। প্রায় ৩৫ বছর পরে যুদ্ধের সময়কার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে সঠিক দিনক্ষণ ভুল হওয়া স্বাভাবিক। তবে কিছু কিছু ঘটনা মনে হচ্ছে সেদিন ঘটে গেল।

এপ্রিলের মাঝামাঝি। বরিশাল শহরে পাকিস্তান বাহিনী এসে যাবে যেকোনো সময়। আমি তখন আঠারো বছরের যুবক। দিদি আমার এক বছরের বড়। পিঠা-পিঠি আরও তিন ভাই বোন। ছোট কাকাও থাকতেন আমাদের সাথে। শহর ছেড়ে পালাচ্ছে সবাই নিরাপদ আশ্রয়ে। আট জনার আমাদের পরিবারটিও একটি নৌকায় চড়ে পাড়ি দিল গ্রামের পথে।

সঙ্গীতকাঠী গ্রাম। সবুজ ধানক্ষেত আর সন্ধ্যাখনি নদী পেরিয়ে মামাবাড়ি এসে পৌঁছলাম। মামা প্রাক্তন চেয়ারম্যান হিসেবে এই বাড়িটিকে সবাই চেয়ারম্যান বাড়ি বা বড় বাড়ি বলে জানে। গ্রামের মধ্যে সবচে দীর্ঘ, উঁচু এবং দামী কাঠের কারুকার্যময় সুন্দর বাড়ি। বদলির চাকরির কারণে বাবা যখন এক শহর থেকে অন্য শহরে যেতেন, খণ্ডকালীন সময়ে মাকে নিয়ে আমরা বরাবর এই মামাবাড়িতে থাকতাম। আমার ছেলেবেলার কয়েকটি বছর এই বাড়িতে থেকেই গ্রামের প্রাইমারি স্কুলে বিদ্যাশিক্ষা শুরু হয়। দিদিমার অকৃত্রিম স্নেহ এবং মামাবাড়ির আনন্দ বরাবর আমাদের আকর্ষণ। অতএব, এই বাড়িতে এসে আমরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম।

বেশিদিন থাকা গেল না মামাবাড়িতে। সবার মধ্যমণি বলে মামা হলেন গ্রামের প্রধান টার্গেট। মামাবাড়ি ছেড়ে এবার আমরা আশ্রয় নিলাম একটি বিশাল পেয়ারা বাগানে। বরিশালের আটঘর-কুড়িআনা ইউনিয়নে অবস্থিত এই পেয়ারা বাগানের কথা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে একটি খণ্ডচিত্র হিসেবে কোথাও লেখা আছে কি না জানা নেই। আনুমানিক হিসেবে এই পেয়ারা বাগান দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে এক থেকে দেড় মাইল করে বিস্তৃত।

যুদ্ধের প্রাথমিক সময়ে কয়েক হাজার গ্রামবাসী এবং যথেষ্ট সংখ্যক মুক্তিযোদ্ধা এই বাগানে অবস্থান নিয়ে ছিলেন। আমরা ছোট ছোট কয়েকটি পরিবারে বিভক্ত হয়ে বাগানের মধ্যে আশ্রয় নিলাম।

পেয়ারা বাগানটি শত শত আইলে বিভক্ত। প্রতিটি আইল প্রায় ১৪-১৫ ফুট প্রশস্ত উচুঁ ঢিবির মতো। আইলের দুধারে সাজানো পেয়ারা গাছের সারি। একটি আইল থেকে আর একটি আইলের মাঝে ১০-১২ ফুট প্রশস্ত পানির খাদ বা নালা। আমরা একটি আইলের ওপরে ছোট মাচা করে ঘর বাঁধলাম। মাচাগুলো ঠিক নৌকোর ওপর ছইয়ের মতো দেখতে। হামাগুড়ি দিয়ে খাঁচার ভেতর ঢুকতে হয়। রান্না হতো মাটির তৈরি চুলোয়। বয়স্ক কেউ পালা করে রাতে জেগে থাকতেন পাহারায়। মাঝে মধ্যে পাশের গ্রামে গিয়ে বাজার করে আনতে হতো অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রী। তাও অনেকের হয়ে একজন যেতেন বাজারে। প্রায়ই খেতে পেতাম শাক-সবজি দিয়ে ভাত, কিংবা কখনো মাড়-ভাত। মনে পড়ে একদিন একটি ছোট মাছ ধরলাম বড়শি দিয়ে মল-বিষ্ঠার মধ্য থেকে। কত না আনন্দ করে খেয়েছিলাম সেই মাছ দিয়ে ভাত। আরও মনে পড়ে, সাবানের পরিবর্তে আমরা আবিষ্কার করেছিলাম কচি পেয়ারা পাতা গায়ে ঘষে স্নান করা যায়। গোলপাতার ছাউনীর নিচে বসে মাদুরের ওপর শুয়ে শুয়ে আমি আমার শখের ট্রানজিস্টার রেডিওতে স্বাধীন-বাংলা বেতার কেন্দ্রের খবর শুনতাম এবং রোমাঞ্চিত হতাম মুক্তিযোদ্ধাদের সাফল্যের সংবাদে। রেডিওর শব্দ যতটা সম্ভব মৃদু করে শুনতাম স্বাধীন বাংলার গান এবং এম আর আকতার মুকুলের ‘চরমপত্র’। আমার ছোট্ট বুকের প্রতিদিনের কামনা ছিল একটাই–জানি মরব, তবে যদি একবার দেখে যেতে পারতাম আমার সাধের স্বাধীন বাংলাদেশ!

প্রায় একমাস এভাবে কাটানোর পর শুনতে পেলাম রাজাকার বাহিনী খবর পেয়ে গেছে, এখানে মুক্তিযোদ্ধারা থাকেন। তারা একদিক থেকে গাছ কাটতে শুরু করল। পাকবাহিনীকে নিয়ে তারা গুলিবর্ষণ শুরু করল মাঝে মাঝে। বিশ্বাস করতেও কষ্ট হয়, আমরা দিনের বেলায় একবুক সমান নালার পানিতে নেমে থাকতাম, আর আমাদের মাথার ওপর দিয়ে সাঁ সাঁ করে ছুটে যেত গুলির শব্দ। সব শান্ত হয়ে এলে আমরা যখন আইলের ওপর উঠে আসতাম, দু'একটা জোঁকের পেট ভরে থাকত আমাদের রক্তে। মৃত্যুভয় থেকে বাঁচতে গিয়ে কোথায় চলে যেত জোঁকের ভয়।

পেয়ারা বাগানের আশ্রয় আর মোটেই নিরাপদ নয়। অনেকেই ভিন্ন ভিন্ন পথে বাগান ছেড়ে যেতে শুরু করেছেন। কোত্থেকে কাকা ছোট দুটো ডিঙা নৌকো জুটিয়ে ফেললেন। বলে রাখি, এই কাকা ছিলেন আমাদের সব কাজের কাজী। কাকা আমাকে আর দিদিকে নিয়ে একটা ডিঙায় উঠলেন। মাকে আর অন্য ভাইবোনকে নিয়ে বাবা উঠলেন অন্য ডিঙায়। রাতের অন্ধকারে অত্যন্ত সাবধানে আমরা পানিতে ভাসালাম আমাদের ডিঙা। পানিতে দাঁড় ফেলার ছপ ছপ শব্দও নিরাপদ মনে হচ্ছে না। কোথাও একটু আলো দেখলে মনে হচ্ছে এই বুঝি আমরা ধরা পড়ে গেলাম। কাকা এবার বৈঠা ফেলে পানিতে নেমে পড়লেন। সাঁতার কেটে কেটে নৌকা ঠেলে নিয়ে যাচ্ছেন। ভাবতে পারা যায় কী কষ্ট না করেছেন তিনি বাঁচার সংগ্রামে। এভাবে কখনো বৈঠা বেয়ে, কখনো হাত দিয়ে পানিতে নৌকা ঠেলে, কখনো দড়ি বেঁধে টেনে টেনে সারা রাত পরে আমরা আমাদের গ্রামে গিয়ে পৌঁছলাম।

তখন কেবল ভোর হয় হয়। গ্রামের ভেতরের খাল দিয়ে যখন যাচ্ছি, দেখি দূরে কোথাও কোথাও আগুন জ্বলছে। আরো কিছুদূর এগুতেই দেখা গেল মামাবাড়িটির আগুন

দাউ দাউ করে জ্বলছে। দূর সম্পর্কের এক বুড়ি মাসী মুখ থুবড়ে পড়ে আছেন খালের পাড়ে। পিঠ ছিঁড়ে বেরিয়ে গেছে গুলি। ভয়ে বেশি এগুতে পারছি না। পেছনেই বা কোথায় যাব? হঠাৎ দেখি, আমাদের এক দাদু খালের পাড় দিয়ে উদ্ভ্রান্তের মতো হেঁটে হেঁটে যাচ্ছেন। জিজ্ঞেস করে জানতে পেলাম, গতকাল পাকবাহিনী এসে পুড়িয়ে দিয়ে গেছে বাড়িঘর। অনেকে মারা পড়েছে, অনেকে পালিয়ে বেঁচেছে। কাকার নির্দেশে আমরা ঝটাপট লাফিয়ে পড়লাম পাড়ে। মুক্তিযোদ্ধাদের মতো ক্রলিং করে করে এগুলাম। মনে হচ্ছে যেন সামনে পাকবাহিনী, আমরা গর্ত খুঁজে কিংবা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে পড়লাম। আবার যখন নির্দেশ পেলাম একে একে বেরিয়ে এলাম আড়াল থেকে। যখন ধারণা পেলাম পাকবাহিনী গ্রামে নেই। তখন ধীরে ধীরে আমাদের বাড়ির দিকে পা বাড়ালাম।

একই গ্রামে প্রায় ৩-৪ মাইল দূরে বাবা-কাকার ছোট দোতলা বাড়ি। আমরা এবার সেই বাড়িতে গিয়ে ঠাঁই নিলাম। দিদির উঠতি বয়স। দেখতে সুন্দরী। তাকে এবং আমাকে নিয়েই বাবার মহা চিন্তা। দিদিকে দোতলার ওপরে একটা ছোট খুপরিঘরে লুকিয়ে রাখা হতো সারা দিন। আমাকে আশ্রয় দিলেন বাবার এক সময়কার ছাত্র পাশের গ্রামের সৈয়দ আলী মাস্টার।

অত্যন্ত স্পষ্ট করে বলতে চাই, একজন মুসলমান একটি হিন্দু পরিবারকে যুদ্ধকালীন বিপদের সময়ে যেভাবে রক্ষা করেছেন আমরা তার প্রমাণ। এ কথা অবশ্যিই সত্যি, অনেকে রাজাকার হয়ে, আলবদর-আলশামস্ হয়ে পাকিস্তানি বাহিনীর দোসর সেজে অনেক হিন্দু-মুসলমানের সম্পত্তি লুটেছে কিংবা জীবন ছিনিয়ে নিয়েছে। একইসাথে একথাও সত্যি অনেক সৈয়দ আলী মাস্টার হিন্দুদের আশ্রয় দিয়ে জীবন রক্ষা করেছেন। জানি না, আমার সৈয়দ আলী মাস্টার এখনো বেঁচে আছেন কি না। আমি তার কাছে অত্যন্ত ঋণী।

সৈয়দ আলী চাচা আমার নাম দিলেন সেলিম বিন আযম। আমাকে তিনি নামাজ পড়া, ওজু করা এবং কিছু কিছু সূরা শিখিয়েছিলেন। প্রতিদিন তার সাথে নামাজে দাঁড়াতাম। তিনি স্বরূপকাঠী স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। তার সাথে প্রতিদিন স্কুলে যেতাম। স্বরূপকাঠী স্কুলের ধার ঘেঁষে নদী। নদীর অন্য পাড়ে লঞ্চঘাট। একদিন স্কুলের জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখি, ওপাড়ে মধ্যবয়সী দুটো লোককে চোখ বাঁধা অবস্থায় লঞ্চের জেটিতে নিয়ে ওঠালো। বেয়নেটের খোঁচা মেরে মেরে ওদেরকে জোর করে দাঁড় করানো হলো। তারপর গুলির শব্দ। লোকদুটোর লাশ নদীতে পড়ে গেলো। চাচা আমাকে আর দেখতে দিলেন না।

দিদিকে নিয়ে বাবার ভয় বাড়তে লাগল প্রতিদিন। সুন্দরী যুবতী দেখলেই রাজাকাররা ধরে নিয়ে যাচ্ছে পাকসেনাদের জন্য–এই খবর বাবা-মার মনে কী দুশ্চিন্তার কারণ হতে পারে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আমি একটি বুদ্ধি খুঁজে পেলাম। নীরোদ বাবু বলে এক অল্প বয়সী ভদ্রলোককে আমরা চিনতাম বহু বছর ধরে। আমরা যখন রাজশাহীতে থাকতাম, ভদ্রলোক তখন সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। বরিশালের গ্রামে বাড়ি বলে ভদ্রলোক প্রায়ই আসতেন আমাদের কুমারপাড়ার বাসায়। রাজশাহী থেকে বরিশাল চলে আসার পরও ভদ্রলোক বেশ কয়েকবার এসেছিলেন আমাদের বাসায়। এরপর তিনি ময়মনসিংহের আনন্দমোহন কলেজে রসায়নের শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। আমি তাঁর অঘোর কলোনির বাসার ঠিকানা জানতাম। আমার মনে হতো দিদির প্রতি তাঁর একটা সুপ্ত আকর্ষণ ছিল। হয়তো সেই কারণেই আমি তাকে শ্রদ্ধা করতাম। আমি তার সঠিক নাম গোপন করে ‘নজরুল ইসলাম’ নাম সম্বোধন করে তাঁর ঠিকানায় একখানা চিঠি পাঠালাম। সংক্ষিপ্ত করে

বললাম, 'একজন গরিব পিতা তার মেয়ের জন্য চিন্তিত। একমাত্র আপনি পারেন তাকে এই বিপদ থেকে রক্ষা করতে। কী আশ্চর্য নীরোদ বাবু ওরফে নজরুল ইসলাম সেলিম বিন আযমের ভগ্নির পাণিগ্রহণ করতে নিমেষের মধ্যে হাজির গ্রামের বাড়িতে। কত দ্রুত চিঠি পৌঁছাতে পারে আর কত দ্রুত তিনি এলেন, আমরা বিস্ময়ে হতবাক। পরের ঘটনা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। বাবা-মা শুধু অশ্রু-জল দিয়ে অগ্নিসাক্ষী করে একখানি ফুলের মালায় জামাই বরণ করলেন। কেউ জানল না, কোনো উলুধ্বনি উঠল না, আমার দিদির বিয়ে হয়ে গেল।

এবার বিদায়ের পালা। দিদি আর আমি এত বেশি ঘনিষ্ঠ ছিলাম যে আমাকে ছাড়া দিদি কিছুতেই যেতে চাইছে না। বাবা দেখলেন, একটি আঠারো বছরের যুবককে কখন যে ধরে নিয়ে যাবে রাজাকাররা কে জানে। তিনি আমাকে দিদির সাথে ছেড়ে দিলেন। আমার ভাবতে কষ্ট হয়, কী করে বাবা এত বড় কঠিন সিদ্ধান্ত নিলেন, তাঁর প্রাণের প্রিয় দুটি প্রাণীকে অজানার পথে তুলে দিতে। দিদির জন্য একটা কালো বোরখা জোগাড় করা হলো। আমরা তিনজন রওনা হলাম বাবা-মাকে প্রণাম করে। ময়মনসিংহ এসে পৌঁছলাম। অঘোর কলোনীর হিন্দু-মুসলমান প্রতিবেশী সবাই এসে দিদিকে আশীর্বাদ করে গেল। শুরু হলো নতুন সংসার। মুক্তিযুদ্ধের বাকি দিনগুলো আমি এখানেই ছিলাম। এখানেই আমার যুদ্ধকালীন অভিজ্ঞতার আর এক অধ্যায়।

আমার সমবয়সী আরও দুটো ছেলে এক পাড়াতে থাকত। আমি ওদেরকে নিয়ে এক অভিযানে নামলাম। 'চরমপত্র' প্রচার অভিযান। আমি চরমপত্র অনুকরণে টুকরো টুকরো ছাড়পত্র লেখা শুরু করলাম। তিনজন মিলে এগুলো আমরা বিভিন্ন লাইব্রেরিতে গিয়ে বইয়ের ভেতরে লুকিয়ে রেখে আসতাম। একদিন এভাবে চরমপত্র নিয়ে পাকিস্তান পরিষদ লাইব্রেরিতে ঢুকেছি। ঢুকেই শুনলাম, একজন (হয়তো রাজাকার) চিৎকার করে বলছে–এখানে মুক্তিবাহিনী আসে, সবাইকে সার্চ করো। একে একে আমাদের পালা এল। সার্চ করে কিছুই পেলো না। ভাগ্য এতটাই ভালো, কী কারণে সেদিন মনে হলো চরমপত্রগুলো খাতার মলাটের ভেতরে রাখি। বেঁচে গেলাম সাক্ষাৎ মরণযাত্রা থেকে!

ডিসেম্বরের ৩ তারিখ। ভারত বাংলাদেশের পক্ষ হয়ে যুদ্ধ ঘোষণা করল পাকিস্তানের বিরুদ্ধে। এক সপ্তাহের মধ্যে যুদ্ধ যখন চরম আকার ধারণ করল, আমরা অঘোর কলোনীর কয়েকটি পরিবার মিলে তখন এক গ্রামে আশ্রয় নিলাম। পরে জানতে পারলাম, আমার দুলাভাইটির নাম ময়মনসিংহের বুদ্ধিজীবী হত্যা-তালিকার শীর্ষে লেখা হয়েছিল। ভাগ্য তাকেও বাঁচিয়ে দিলো। এখানে একটা ছোট অভিজ্ঞতার কথা না বললেই নয়। মানুষ মানুষকে কতটা আপন করতে পারে তার একটা সুন্দর উদাহরণ। অঘোর কলোনীর যে দু'একটি পরিবার আমাদের সাথে পালিয়ে গেল গ্রামে, তাদের মধ্যে একটি প্রায় দেড় বছরের মেয়ে, নামটি এখনো মনে আছে লিসা। পাশের বাসায় থাকত। লিসা প্রায়ই আমার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ত ওদের বাসায় গেলে। লিসার বড় বড় চোখদুটো আমাকে খুব কাছে টানত। গ্রামের বাড়িতে আমরা এক বাড়িতেই আশ্রয় নিলাম। কিছুদিন পরেই শুনলাম ময়মনসিংহ স্বাধীন হয়েছে। আমি শহরে আসার জন্য পাগল হয়ে গেলাম। আমার প্রিয় দিদিকেও ফেলে আমি মুক্তির আনন্দে শহরে ছুটে যাচ্ছি। হঠাৎ শুনি লিসার কান্না। আমি পেছনে ফিরে গিয়ে দুহাত বাড়ালাম। লিসা ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার কোলে। বাবা-মাকে ফেলে লিসা আমার সাথে যাবে। ওকে ছেড়ে আসতে সেদিন আমার দুচোখ ভরে কান্না এসেছিল। লিসা, তুমি এখন কত বড় হয়েছ? তোমার সুন্দর দুটি চোখে এখন কেমন বাংলাদেশ?

বিদ্রোহী কলম

আমিনুর রশীদ পিন্টু

বিদ্রোহী হয়ে আমি কখনো জন্মাইনি –
প্রথম আলোর পরশে যখন শুনেছি
আঁতুড় ঘরে মা'র নন্দিত চিৎকার আর
বাবার ললিত কণ্ঠের আজানের ধ্বনি
কেউ এসে তখন ধরিয়ে দেয়নি
ডাস্ ক্যাপিটাল অথবা বিপ্লবের লালঝান্ডা ।
হাতের মাঝে ঝুনঝুনির শব্দেই শুনেছি
অনেক শিশুর ক্রন্দনধ্বনি । কারখানার
আগুনে ঝলসে গেছে তার বাবার
দু'খানি হাত । এই সবি একটু একটু
করে আমার হাতে দিয়ে গেছে
পৃথিবীর নীলাভ-বেদনা সমগ্র একটি
প্রতিরোধের মন্ত্র উচ্চারিত কলম ।
তাইতো শিল্পের কথা বলতে গিয়ে
কণ্ঠে অনুভব করি উত্তপ্ত গোলার
মতো কিছু । অথচ-আমি তো
একজন হেসে খল্‌খল্‌ গেয়ে
কল্‌কল্‌ শিশুর মতোই
বেড়ে উঠতে চেয়েছিলাম
গান গাইতে চেয়েছিলাম ।

মাকে না পাঠানো চিঠি (আমিনুর রশীদ পিন্টু)

মা
তুমি কেমন আছো
এমনি আমার ব্যস্ত ভাবনা--এতো সাগর নদী
উপকূল পেরিয়ে যখন তোমার হাতে আসবে,
ততদিনে সপ্তাহের সাতটি দিনই পার হয়ে গেছে।
এই জন্যেই মা, আজকাল সবাই ই-মেইল করে,
ডাকঘরে কেউ আর যায় না। তুমি বললে
এই সব ইংরেজী কথাবার্তা তোমার ভালো
লাগে না। কিন্তু তোমাকে কেমন করে
বোঝাবো আজকাল টেকনোলজির যুগ।
এখন সময় সবার হাতের মুঠোয়। এই তো
দেখলে না মাদার'স ডে-র দিন তোমার জন্যে
পাঠালাম চকোলেট কেক। দোকানে যেতে
হয়নি, লাইনে দাঁড়াতে হয়নি। ক্লিক্ করেছি
অন লাইনে ছয় ঘন্টার মধ্যে তোমার কাছে
এসে হাজির। জানি তুমি এই সব খাও না।
তবু পাঠালাম। পাঠাতে যে খুব ইচ্ছে হয়।
তোমার কথা যে আমার খুব মনে পড়ে।

আচ্ছা মা কুসুমের কি বিয়ে হয়ে গিয়েছে, জানি
ও আমাকে খুব ভালোবাসে। কিন্তু মা ভালোবাসাতো
হৃদয়ের ঝিনুক বন্দী এক সহস্র বছরের মিলন
আশ্রয়। যদি কখনও দুয়ার ভেঙে এইসব
ইচ্ছেগুলি মহাশূন্যে মিলিয়ে যায় ফিরে কি পাবো
ওইসব মধুময় দিনগুলি তুমি ওকে একটু
বুঝিয়ে বলো। আমার এই পলাতক পথের
শেষ মোহনায় যদি কখনো কুসুমের দেখা পাই,
ক্ষমা চেয়ে নেব। এই যে কথার খেই হারিয়ে
ফেলছি। এবার বলো তোমার পৃথিবীটা
কেমন আছে?

মেহেরটা তোমাকে ঠিকমত রান্না করে দেয় তো?
আহারে। মেয়েটা সংসার আর করলো না।
তোমার কাছেই কাটিয়ে দিলো ওরা জীবনের
পুষ্পিত দিনগুলি। ভাবছি এবার কিছু টাকা
পাঠাবো। ওকে একটা ভালো শাড়ি কিনে দিও।
ওর বাবা বলেছিলো টিনের চালার জন্যে
কিছু টাকা দিতে। বরষার মউশুমে
বৃষ্টিতে ভিজে যায় ঘর উঠোন সবকিছু।

আর তোমার জন্য কি পাঠাবো? তুমি শুধু বলো
ভাইটামিন। কেন, আর কিছু কি চাইবার নেই।
ছোটবেলায় তোমার কাছেই চেয়েছি আইসক্রিম,
ফুটবল, আতসবাজি, চিড়ের নাড়ু, নারকেলের
সন্দেশ আর গুড়ের পায়েস। চেয়েছি
আঁচলের মুগ্ধ আড়াল। ওখানেই মাথা পেতে
রেখে মুখস্ত করেছি ইতিহাস, ভূগোল আর
জ্যামিতি। আজ পৃথিবীর এই প্রান্তে এসে
দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছে--এসবের কিছুই হতো না
যদি না তোমার স্নেহার্দ্র হৃদেয়র সমস্ত
সঞ্চয় আমার হাতে তুলে দিতে।

থাক, আজ আর বেদনার কথা নয়। তোমার
কথা আবার শুনি। ওষধ পত্র ঠিকমতো খাচ্ছো তো?
ডাক্তার কাকা নিয়মিত প্রেশারটা দেখে যাচ্ছেন তো?
আর গোসলটা বিকেলে এতো দেরী করে
করো না। ঘুসঘুসে জ্বরটা ওই কারণেই আসে।
আচ্ছা মা, বাবার লাগানো নারকেল গাছগুলি
কি ঠিক আগের মতোই আছে? আর বাড়ির
সামনের মাঠটা, লতার ঝোপটা, বাবার হাতে
লাগানো। দেখতে দেখতে ছয়টি বছর পার
হয়ে গেলো। বাবা নেই কিন্তু চিহ্ন রয়ে গেছে
এ বাড়ির প্রতিটি দেয়ালে দেয়ালে।

আচ্ছা মা ময়মনসিংহের নদীর পাড়টা এখনো
কি তেমনি আছে? সেই কড়ই গাছ বিশাল
বিশাল শিমূল গাছ। গাছের ডালে উড়ে বেড়াতো
শালিক আর দোয়েল। মাঝে মাঝে নদীর অগভীর
জল ছুঁয়ে উড়ে আসতো বক পাখির মিছিল।
কাশবনের পাশ দিয়ে ভেসে বেড়াতো ডিঙি
নৌকার মতো রঙ-বেরঙের পানকৌড়ি। আরো দূরে
দেখা যেতো ধূসর গারো পাহাড়। জানো মা
সেদিন গিয়েছিলাম এ্যারিজোনার বড় বড় পাহাড়
দেখতে। কিন্তু মনে হচ্ছিলো আকাশের দেয়াল
হেলান দিয়ে দাঁড়ানো ওই পাহাড়গুলি আরো সুন্দর।

যেমন তুলনাহীন বাংলার আকাশ ভেঙ্গে পড়া
শ্রাবনের জল, যেমন - সরষের ক্ষেতে ভেসে বেড়ানো
পড়ন্ত শীতের আঁচল, যেমন বকুল আর যুঁথীর
শিউলি সুগন্ধ, যেমন সজনে আর পেয়ারার ডালে

লুকোচুরি খেলা ভোরের ঝিলিমিলি আলো ।
এইসব কিছুই দেখিনা এই নতুন পৃথিবীতে ।
আমি শুধু বিহ্বল নয়নে তোমাকে খুঁজি
বেড়াই শুধু তোমাকে খুঁজে বেড়াই ।

নামহীন ছড়া

Avbmvix Lvb

[স্বাধীনতার বর্তমান রূপ দেখার দুর্ভাগ্য যাদের হয়নি–স্বাধীনতাযুদ্ধের সেই মহান সৈনিকদের উদ্দেশ্যে এই ছড়া নিবেদিত। মাটির জন্যে এ শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে যাঁরা মানুষের আদর্শ বাসভূমি বানাতে চেয়েছিলেন, – তাঁদের অযোগ্য উত্তরসূরি হিসাবে এই ছড়ায় রয়েছে শ্লেষ এবং আত্মসমালোচনাপ্রসূত স্বীকারোক্তি – মানবিকতার অবক্ষয়ের ইতিহাস। এই ইতিহাস জীবন দিয়ে কেনা, এবং তাই, এই ছড়ার কোনো নাম নেই।]

বিজয় দিবস–বিজয় দিবস?
কেমন বিজয়, কিসের দিবস?
পড়ছে না তো মনে!

লেত্তি দিয়ে লাট্টু ঘোরে
মাঞ্জা দিয়ে ঘুড্ডি ওড়ে,
গাঞ্জা খেলে মগজ ঘোরে,
বিজয় দিয়ে কি হয়?
পড়ছে না তো মনে!

বিদ্যা মিয়া টঙ্কা ছাড়ে
টঙ্কা দিয়ে চর্বি বাড়ে।
বাড়তি চর্বি সুযোগ কাড়ে
বোকা বাঙালিদের।
বিজয় দিয়ে কি হয়?
পড়ছে না তো মনে!

অর্থনীতির সংজ্ঞা জানি
রাজবিদ্যার অর্থ জানি,
জীবন-যাপন ধন্য মানি

বুদ্ধিবৃত্তির ঘোরে।
রাজ্য নিয়ে কাড়াকাড়ি
বিদ্যা নিয়ে বাড়াবাড়ি,
'ইজম' নিয়ে দৌড়াদৌড়ি,
সুযোগ বুঝেই উঁকি মারি
সেনাপতির দোরে।
বিজয় দিয়ে কি হয়?
পড়ছে না তো মনে!

যাচ্ছ কোথায়– যাচ্ছ কোথায়?
এই পেয়েছি, একটু দাঁড়াও,
পড়ছে এবার মনে।
'গন্ডগোলের বছর' একাত্তুরের সনে
ড্যাডির কাছে গল্প শুনে
বুঝেছিলাম মনে মনে,
ভৃগুর দলে মারছে লাথি ভগবানের বুকে।
সেই না সুখে আত্মহারা
ভাবল সবাই যাচ্ছে মারা,
ক্ষেতের মাঝে বাঁধনহারা
ভগবানের দূত।

ভ্রাতৃসম হৃদয় আমার
দুঃখবোধে হয় একাকার।
তাই তো আমি হই রাজাকার
দুষ্টলোকের ভাষায়।
ভাবছ তারা গেছে চলে?
রক্তে আমার নেশা দোলে
জীবন বাজি, রাখছি বলে,

রাখছি তোদের বলে–
আছি 'তাহাদেরই' আশায়।
বিজয় দিয়ে কি হয়,
পড়ছে এখন মনে।

বিজ্ঞানেরই শিক্ষা জানি,
কূটকৌশল রপ্ত জানি,
নেতাদেরও মাথা জানি
গোপন গোপন শখও জানি,
তাল মিলিয়ে চলতে জানি,
তাই তো আমি আছি।

সংস্কৃতির বাহক হয়ে
আরবি ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে
নেতৃজনের প্রভু হয়ে
মাটির কাছাকাছি–
এই তো আমি আছি ।
বিজয় দিবস–বিজয় দিবস,
এইতো বিজয়--এইতো দিবস,
বিজয় দিবস পার্টি?
পড়ছে এবার মনে ।

হঠাৎ আবার একি হলো?
‘বিচ্ছু’ গুলো কোথায় ছিল?’
কিচ্ছা দিয়ে মন ভোলে না
রক্ত ঝরাতে চায়?

অর্থনীতির সংজ্ঞা জানি
রাজবিদ্যার অর্থ জানি,
রক্ত ঝরায় কষ্ট জানি
ড্যাডি আমার বাবা জানি,
নিরুদ্দেশের অর্থ জানি
জানি, আমি সবই জানি ।
বিজয় দিবস কেমন জানি,
বাঙলা আমার ভাষা জানি,
মাটি আমার জীবন জানি,
জানি, আমি সবই জানি ।
জানি আমি কোথায়?

– পড়ছে না তো মনে ।

আতিকুর রহমান

স্মৃতির বাঁকে

কোনো এক গোধূলি লগ্নে
সমুদ্র ধারে বসে দেখছিলাম
বালুচর আর ঢেউয়ের খেলা।
বিপুল জলরাশি যেন
একের পর এক আলিঙ্গন
করে যাচ্ছে বেলাভূমিটিকে।
এ যেন সেই সোনাঝরা
আলোর দিনের এক মোহময়ী
প্রেমালিঙ্গনের উষ্ণ শিহরণ,
এক স্নিগ্ধ রোমাঞ্চিত অনুভূতি
হঠাৎ ফেলে আসা অতীতের
মোহনায় মিলিত হয়ে
হারিয়ে গেল স্মৃতির বাঁকে।
কী এমন আঘাত দিয়েছি
যা কিনা আজও লালন
করছো চুপিসারে তোমার
সুকোমল হৃদয়ের নীলকৌটায়?

অভিমানিনী, সবকিছু ভুলে
এসো ফিরে, এই বুকে
আজও আছো তুমি ভালোবাসার
স্বপ্নিল অনুরাগের এক
অনন্তকালের পরশ হয়ে।

নন্দিনী

প্রিয় নন্দিনী,
আর কতোকাল তুমি কুহেলিকার পেছনে ছুটবে?
এই আমি তোমার জন্যে ভালোবাসার অর্ঘ্য নিয়ে
সেই যে দাঁড়িয়ে আছি, অথচ তুমি বুঝলে না
আমার গভীরে তোমার অবস্থান,
তোমার প্রতি আমার অনুভূতি, অনুভব করলে না।
পার্থিব প্রতিপত্তির পেছনে ছুটে যে ভালোবাসার
সন্ধান তুমি করছো, তা কোনোদিন পাওয়ার নয়,
ভালোবাসা ধরা বা ছোঁয়া যায় না–
উপলব্ধি করা যায় মাত্র।

নন্দিনী–
দিব্য চোখে তুমি যা দেখতে পাচ্ছো
ভাবছো সবই সত্য,
তাই যদি হতো, তাহলে তুমি

আমার মনকে দেখতে পেতে ।
দৃষ্টির আড়ালেও ব্যপ্তি আছে,
এ পৃথিবী এক মায়া কানন!

অপেক্ষা করছি, দেখতে পাবে ।

নন্দিনী–
বলতে পার, আর কতোকাল
অপেক্ষা করবো?
তুমি আমাকে দেখতে
পাবে?তোমার মনের পর্দা তুলে
দেব –
এই আমি তোমার জন্য, আজও
অর্ঘ্য হাতে দাঁড়িয়ে আছি ।
প্রদীপ জ্বালিয়ে অমাবস্যার রাতে

দৃষ্টির কারাগারে

বিমল কান্তি পাল

লবিতে লোক জনে গিজ গিজ করছে। কোথাও তিল ধারনের জায়গা নেই। এরই মধ্যে অনেক কষ্ট করে কোন রকমে ঢুকে পড়ে রতন। সম্মেলনে এতো লোকের সমাগম হবে তা ছিলো ওর ধারণার বাইরে। একই সময়ে দু'টি শহরে দু'টি বাংলাদেশ সম্মেলন। দু'জায়গায় ভাগা-ভাগির পর এখানে এতো লোক দেখে বিস্মিত হয় রতন। দু'বছর আগের শিকাগোর সম্মেলনের কথা মনে পড়ে রতনের। সেখানে সব মিলে তিন-চারশ লোক হয়েছিলো বলে ওর ধারনা।

ভীড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক তাকাতে থাকে রতন, উদ্দেশ্য, পরিচিত কেউ এসেছে কিনা তা খুঁজে বের করা। ওর বেশ ক'জন বন্ধুর আসার কথা। আসলে ওদের জোরা-জুরির জন্যেই রতনের এখানে আসা। তা না হলে এতো দুরে আসতো না সে। কিন্তু ওদের খুঁজতে গিয়ে রতনের চোখ গিয়ে পড়ে লিফটের কাছে দাঁড়িয়ে থাকা দু'জন তরুণীর দিকে। অসম্ভব মিষ্টি চেহারা দু'জনের। সদ্য ফোটা গোলাপের সৌন্দর্যও যেন ম্লান হয়ে যায় ওদের রূপের কাছে।

রতন মুগ্ধ হয়ে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে মেয়ে দু'টির দিকে। এভাবে কতোক্ষণ কেটে যায়, তা বলতে পারবে না রতন। তবে এক সময় সে ঠিকই বুঝতে পারে, এমন করে তাকিয়ে থাকাটা শোভনীয় নয়। অন্যরা দেখলে খারাপ ভাববে। হ্যাংলা মনে করবে। তাই অন্য দিকে দৃষ্টি ফেরানোর চেষ্টা করে রতন।

বয়স বাড়ছে। মাথার চুল সাদা হতে শুরু করেছে। তবুও চোখের ভীমরতি গেল না। কবে যাবে তারও কোন হদিস নেই। আপাততঃ এসব নিয়ে ভাবতে চায় না রতন। বরং সে চোখের পক্ষ নেয়। চোখ দু'টি আছে বলেই তো আকাংঙ্খিত জিনিষ দেখার সুযোগ পায় রতন। দেখে ক্ষণিকের জন্যে হলেও আনন্দহীন বেদনায় ভরা রতনের পৃথিবী হয়ে ওঠে মধুময়। রতন ভালো করেই জানে ওর এই মুহূর্তের অনাবিল সুখের পৃথিবী পরের যে কোন মুহূর্তেই হয়ে উঠতে পারে বিষময়। তবে পরের ঘটনা নিয়ে এমন ভাবা ঠিক নয়, আনন্দ দূর্লভ বস্তু। সেই আনন্দ যখন কাছেই এসে গেছে তখন তাকে নিয়েই পুরোপুরি ব্যস্ত থাকতে চায় রতন।

সুন্দরীদের সবারই ভালো লাগার কথা। তবে এ ব্যাপারে রতনের বাড়া-বাড়ি অনেক বেশী। সুন্দরী বলতে রতন বুঝে শুধুমাত্র মিষ্টি মুখের অধিকারিনীদের। মুখশ্রী ছাড়া মেয়েদের শারীরিক গঠন, রঙ বা গুণের কোন স্থান নেই রতনের সুন্দরী সংজ্ঞায়।

রতন ভালো করেই বুঝে চেহারার উপর একক গুরুত্ব দেয়া ঠিক নয়। সত্য কথা বলতে কি, চেহারার উপর যদি মেয়েরা বিশেষ প্রাধান্য দেয় তবে খুব কম সংখ্যক মেয়েই রতনকে পছন্দ করবে। একথা জেনেও রতন ওর সুন্দরীর সংজ্ঞা সংশোধনে বিন্দু মাত্র আগ্রহী নয়।

দু'টি তরুণীর এক জনের মুখ গোল-গাল। স্বাস্থ্যবতী কোমর অব্দি লম্বা চুল। মাঝারী উচ্চতা। আমেরিকানদের মতো ফর্সা। পরনে কালো শাড়ী। অন্যজনের মুখ লম্বাটে। বব ছাট চুল। পাতলা গড়ন। বেশ লম্বা। গায়ের রঙ শ্যামলা। পরনে কাজ করা সালোয়ার কামিজ।

দু'জনেরই পোষাক সংযত। কোমর ও বুকের উপর যথাযথ আবৃত। দু'জনকেই চমৎকার মানিয়েছে পোষাকে। রতনের সহসা মনে হয়, ওদের দু'জনের পোষাক যদি রদ-বদল করা হয় তাহলে ওদেরকে কেমন লাগবে। আসলে যারা সুন্দরী তাদেরকে যেকোন পোষাকেই ভালো লাগে। রতন দ্রুত উপসংহারে পৌঁছে।

রতনের গোল মুখের মেয়েদের প্রতি একটা বিশেষ দূর্বলতা রয়েছে। এই প্রথম সে একজন লম্বাটে মুখের মেয়েকে পছন্দ করছে। দু'জনের নাম জানতে ইচ্ছে করলো রতনের। সে লক্ষ্য করলো মেয়ে দু'টির বুকে নেম ট্যাগ লাগানো। বেশ দূরে দাঁড়িয়ে আছে বলে নাম পড়া যাচ্ছে না।

কিভাবে ওদের নাম জানা যায়? ওদের কাছে গিয়ে নাম পড়ে আসবে নাকি? না, তাহলে ওরা হয়তো বুঝতে পারবে। বুঝলে খারাপ ভাবতে পারে। এই মুহূর্তে ওর সম্পর্কে ওরা খারাপ ধারণা করুক তা রতনের কাম্য নয়।

রতন ঠিক করে সে রুমে যাবে। সে উদ্দেশ্যে লিফটের দিকে পা বাড়ায়। লিফটের কাছে আসতেই হাঁটার গতি কমিয়ে দেয়। ফলে মেয়ে দু'টির নাম পড়তে কোন অসুবিধা হয় না রতনের। একজনের নাম লাভলী। অন্যজনের নাম বিউটি। বাহ! অর্থবহ নামই বটে। নামের সাথে চেহারার এমন অপূর্ব মিল সহসা কখনো হয় না।

লিফট এসে গেল। লিফটের ভিতর দাঁড়িয়ে লাভলী ও বিউটির কথা ভাবতে থাকে রতন। কাল বিকেলে সেমিনার। সেমিনারে পেপার পড়বে রতন। সেখানে কি ওরা আসবে? সম্ভাবনা খুবই কম। সেমিনার সুন্দরীদের জন্যে নয়। ওদের উপযুক্ত স্থান হবে শাড়ীর অথবা জুয়েলারীর স্টল।

তবুও সেমিনারের জন্যে ভালো প্রস্তুতি নিবে রতন। অঘটন যে ঘটে না এমন নয়। হঠাৎ করে ওরা এসেও যেতে পারে। ওদের উপস্থিতিতে যেন-তেন ভাবে পেপার পড়বে না রতন। এর পরিণতি খারাপ হতে পারে। রতনের বুকটা কেমন যেন হু হু করে ওঠে। নিজকে অসহায় মনে হয় রতনের।

সাত তলায় এসে লিফটের দরজা খুলে যায়। রতন অন্যমনস্ক ছিলো বলে প্রথমে টের পায়নি। পরে বুঝতে পেরে দ্রুত লিফট থেকে নেমে যায়। নিজের রুমে গিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে নেয়। তারপর পেপার নিয়ে বসে।

পেপারে মন বসাতে পারে না রতন। বার বার মনে হচ্ছে লাভলী ও বিউটির কথা। মন থেকে কিছুতেই দূর করতে পারছে না ওদেরকে। নানান কথা ভাবার চেষ্টা করে। কিন্তু মাথায় একই জিনিষ অবিরত ঘুরপাক খাচ্ছে। রতন বুঝতে পারে ওর পুরানো অসুখটা আবার মাথা চাড়া দিয়ে ওঠবে এখনই। তার সব লক্ষণ স্পষ্ট বুঝতে পারে রতন।

রতন বসে থাকতে পারে না। ওঠে দাঁড়ায়। ওর দম বন্ধ হয়ে আসছে। রুমের ভিতর পায়চারী করতে থাকে রতন। কিন্তু তাতেও স্বস্তি পায় না। অগত্যা টিভি ছেড়ে দেয়। বার বার চ্যানেল ঘুরাতে থাকে। কোন চ্যানেলই ভালো লাগে না ওর। কেমন এক দুঃসহ অস্থিরতায় ছটফট করতে থাকে রতন। ওর বুক জ্বলে যায়। জ্বলন্ত বুককে ঠান্ডা করতে দোতলার বারে যাবার সিদ্ধান্ত নেয়।

দোতলায় এসে লবির দিকে তাকায় রতন। দেখে, আগের মতোই ভিড়। কিন্তু লাভলী ও বিউটি লবিতে নেই। কিছুটা আশাহত হয়ে বারে ঢুকে রতন। বারে লোক-জন নেই বললেই চলে। ফাঁকা বার। রতনের ভালোই লাগলো। নিশ্চিন্তে মদ গিলতে পারবে সে।

বারের এক কোনার একটি খালি চেয়ারে গিয়ে বসে রতন। এদিক-ওদিক ভালো করে তাকিয়ে নেয় সে। এই তাকানোটা রতনের অনেক দিনের অভ্যাস। ওর বন্ধুরা বলে বদঅভ্যাস। এই তাকানোর জন্যেই রতনকে মাঝে মধ্যে দূর্ভোগ পোহাতে হয়। অন্যদের যন্ত্রনা দেয় তাদের অবুঝ মন। কিন্তু রতনকে যন্ত্রনা দেয় ওর দু'টি চোখ। তার পরের স্থান মনের। কাকে ভালো লাগে তা চোখ বলে দেয় মনকে। চোখের প্ররোচনায় মন হয় ওঠে পাগল।

মন একবার উতলা হলে তাকে কিছুতেই কিছু বোঝানো যায় না। বোঝানো যায় না জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও গোত্রের পার্থক্য। এমনকি বিবাহিত-অবিবাহিত বা বয়সের ব্যবধানও যেন কোন প্রতিবন্ধক নয়।

রতন বুঝতে পারে হুইস্কির অর্ডার দিতে আর বিলম্ব করা উচিত নয়। চেয়ার থেকে ওঠে গিয়ে সে নিজেই হুইস্কি নিয়ে আসে। হুইস্কি খেতে খেতে আবার আশে-পাশের দিকে তাকায় রতন।

রতন লক্ষ্য করলো, পাশের টেবিলে দু'জন লোক সব খাচ্ছে। এরা কখন এসেছে তা খেয়াল করেনি রতন। লোক দু'টির একজনের চোখে ঘন কালো রঙের দশমা। বোধ হয় অন্ধ। রতন ভাবে, অন্ধদের নিশ্চয়ই ওর মতো বুক জ্বালা করে না। কারণ চোখ নিয়ে রতনের যে সমস্যা ওদের সে সমস্যা নেই। ওরা বুঝি খুব সুখী মানুষ। শুধু অন্ধরা কেন গোটা আমেরিকার পুরুষরাই সুখী। ওদের সুন্দরীর সংজ্ঞা ভিন্নতর, সে সংজ্ঞায় মুখশ্রীর একক প্রাধান্য নেই। আর এজন্যেই মিস আমেরিকা প্রতিযোগিতায় রতন প্রতি বছর যাকে সবচেয়ে সুন্দরী মনে করে সে বরাবরই দ্বিতীয় রাউন্ডে গিয়ে বাদ পড়ে যায়।

হুইস্কিতে কোন স্বাদ পাচ্ছে না রতন। ভীষণ ক্লান্ত অনুভব করে সে। ভাবে, বিছানায় শুতে পারলে হয়তো ভালো লাগবে। অডিটরিয়ামে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হচ্ছে। সেখানে গেলে গান শুনতে পারবে। নাচ দেখতে পারবে। বন্ধুদের সাথেও দেখা হয়ে যেতে পারে। কিন্তু অডিটরিয়ামে না গিয়ে নিজের রুমে ফিরে যায় রতন। কাপড় ছেড়ে বিছানায় শুয়ে পড়ে সে।

পরদিন ঘুম থেকে উঠতে অনেক দেরী হয়ে যায় রতনের। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু হবে কিছু ক্ষণের মধ্যেই। তাড়াতাড়ি হাত-মুখ ধুয়ে অডিটরিয়ামের দিকে যায় রতন। কিন্তু অনুষ্ঠান শুরু হবার কোন লক্ষণ নেই। অডিটরিয়ামে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে মাত্র পনের বিশ জন লোক। অনুষ্ঠান কখন শুরু হবে তা তারা কেউ বলতে পারে না।

অডিটরিয়াম থেকে বের হয়ে আসে রতন। অডিটরিয়ামে লোকের আনা-গোনা না থাকলেও বাইরের শাড়ীর ও গয়নার স্টলে অসম্ভব ভীড়। লাভলী ও বিউটি নিশ্চয়ই এই ভীড়ের মধ্যে কোথাও হারিয়ে আছে। কিন্তু রতনের চোখ ওদেরকে খুঁজে পেল না। তবে কি রতনের আগের দিনের ধারণা ভুল। তাহলে কি ওরা অন্য সব সুন্দরীদের চেয়ে আলাদা? রতনের মুখে সহসা খুশীর বন্যা বয়ে যায়। ওর মন হালকা মেঘের মতো কল্পনার নীলাকাশে ইচ্ছে মতো ভেসে বেড়াতে লাগলো।

সব অনুষ্ঠানের মতোই রতনের সেমিনার শুরু হয়েছে। দু'ঘণ্টা দেরীতে তিনজন বক্তা ও তিনজন শ্রোতা নিয়ে। বক্তা এবং শ্রোতাদের সবাই পুরুষ। রতনের মনটা কাল-বৈশাখীর ঘন কালো মেঘে যেন ছেয়ে গেছে। আসলে ওর আগের দিনের ধারণাই ঠিক। সুন্দরীরা সেমিনারের গুরুত্ব কি বুঝবে? লাভলী ও বিউটি নিশ্চয়ই সন্ধ্যার গান বাজনার অনুষ্ঠানে আসবে। রতনের মনে পড়লো নেম ট্যাগের সাথে ওদের শহরের নাম লেখা ছিলো। ওরা নিউইয়র্ক থেকে এসেছে। কাছে বলে নিউইয়র্ক থেকে অনেক জনই সম্মেলনে আসা যাওয়া করছে।

রতনের ধারণা ঠিক। আজ রাতে ওর এক ঘনিষ্ট বন্ধুর বিয়ে। সেখানে যাবে রতন। সেমিনার শেষে রতন সোজা লবিতে নেমে আসে। আগেই চেক আউট করে ফেলেছে। কাউন্টার থেকে নিজের ব্যাগটা নিয়ে হোটেলের গেটে যায় ট্যাক্সির জন্যে। এয়ারপোর্টে যাবে।

এরই মধ্যে একটি সাদা গাড়ী হোটেলের গেটে প্রবেশ করে। লাভলী ও বিউটি গাড়ীতে বসা। ওরা গাড়ী থেকে নেমে হোটেলের লবিতে ঢুকে পড়ে। সেদিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে রতন। টেক্সির জন্যে রতনের দৃষ্টি ভ্রষ্ট হয়। মাটি থেকে হাত ব্যাগটা তুলে নিয়ে টেক্সিতে গিয়ে বসে রতন। টেক্সি ছেড়ে দেয়। প্রথমে আস্তে ও পরে দ্রুত গতিতে গন্তব্য স্থলের দিকে এগিয়ে চলে ট্যাক্সি।

তুমিই তো

বদিউজ্জামান নাসিম

তুমিই তো,
আরেক বসন্ত রাতে
হাতে হাত রেখে বলেছিলে :

এ-হাত বেহাত হলে
গিলবো বিষ দু'হাতে ।

তুমিও তো

তুমিও তো,
জেগেছিলে অপেক্ষায়;
যেমন জাগে বন্দী মহেশ
বৈশাখের বৈশাখি রাতে–

কবে এক বিপন্ন গফুরের অলৌকিক আধুলি
তোমায় মুক্তি দেবে ।

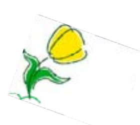

জংলী ফুলের সুগন্ধ

হাবিবুর রহমান

ঢাকা শহরে থাকার মত কোন জায়গাই পেলনা সুমন। সে এখন ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তাহলে কি তার পড়াশুনা বন্ধ হয়ে যাবে? তাকে কি গ্রামেই ফিরে যেতে হবে? ফার্মগেটের বাসস্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে এসব ভাবছিল। ভাবতে ভাবতে সে ইন্দিরা রোড ধরে হাঁটতে লাগল। কাছাকাছি তার সহপাঠী তমালদের বাড়ি। বিকেল চারটা বাজে, তমাল কি এখন বাড়ি আছে? একটু ঢুঁ মেরে যাওয়া যাক – সে তমালদের বাড়ির দিকে এগুচ্ছিল আর ঠিক তখনই তমাল একটা রিক্সায় বসে ওকেই ডাকছে। রিক্সায় ওঠতে ওঠতে সুমন বললো তোর কাছেই যাচ্ছিলাম, তা কোথায় যাচ্ছিস?

তমাল বলল, সিদু মামার ওখানে যাচ্ছি, কলেজ গেট, চল ঘুরে আসি, তোর হাতে সময় আছে?

– সময়? আমার হাতে প্রচুর সময়। ঢাকায় বোধহয় আর থাকতে পারছি না, কোথায় যাব বল?

– ও তুই এখনো থাকার যায়গা পাসনি। আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে, চল সিদু মামাকে বলে দেখি, উনি ওখানে মেসে থাকেন। দেখা যাক কোন ব্যবস্থা করা যায় কি না।

তমালের সিদু মামার মেসে যেয়ে যখন ওরা উঠলো তখন প্রায় সন্ধ্যা হয়েছে। দেখা গেল সবাই বেশ আড্ডা জমিয়েছে, চিনেবাদাম, চা খাচ্ছে আর বেশ রসিয়ে গল্প করছে। তামাল আর সুমনকে দেখেই সিদু হই হই করে ওঠলেন। তমাল সুমনকে সবার সাথে পরিচয় করিয়ে দিল। তারপর আরও চা এলো, তার সাথে সিঙ্গারা এলো, গল্পের আসরও চলতে লাগলো। ওদের মধ্যে একজনের নাম মনু, বোঝা গেল সে কোন এক চৌধুরী সাহেবের ড্রাইভার। তুখোর গল্প বলতে পারে, অনর্গল কথা বলে যাচ্ছে। সে বলছিলো চৌধুরীর বাসায় মহা সমস্যা, কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না। চৌধুরী যা করেন চৌধুরী গিন্নি তার উল্টোটা করেন। চৌধুরী নাকি একজন যুবতী চাকরানী রেখেছিলেন বাসায় কাজ করার জন্য। মেয়েটির বিয়ে হয়েছিল, জামাই তাকে ফেলে কোথায় পালিয়েছে খবর নেই অথবা আর একটা বিয়ে করেছে কে জানে? এসব ঘটনা অবশ্য চৌধুরীর কাছে নতুন কিছু নয়। কারণ এ ধরণের দুরবস্থার যারা শিকার তাদেরকে ব্যবহার করে ফায়দা লুটাই চৌধুরীর কাজ। তার হাতে কাজেরও অভাব নেই, সবার ব্যবস্থাই তিনি করতে পারেন। চৌধুরী এ মেয়েটিকে নিজের ঘরেই নিয়ে এলেন, বাসায় একজন কাজের লোক দরকার আর মেয়েটিরও একটা গতি হলো। কিন্তু বিধি বাম, চৌধুরী গিন্নির প্রথম থেকেই সন্দেহ, সোমত্ত মেয়ে, চৌধুরীকে বিশ্বাস কি? মেয়েটিকে পরের দিনই বিদায় করে দিয়ে, তিনি নিয়ে এলেন একটা তাগড়া ছেলেকে বাসার কাজের জন্য। এবার চৌধুরী তার গিন্নিকে সন্দেহ করতে শুরু করলেন। এই নিয়ে প্রথমে প্রচণ্ড বচসা, তারপর হাতাহাতি। চৌধুরীর মাথায় এমনিতেই চুল কম, তার বউ একগোছা চুল ধরে উপড়ে দিয়েছে। মনু যেয়ে কোনরকমে থামিয়েছিল, তা না

হলে আরও কি হতো বলা যায় না। বাসা এখন ভীষণ থমথমে। যাকে নিয়ে এই কাণ্ড সেই ছোড়া পালিয়ে বেঁচেছে। এখন রান্না-বান্না বন্ধ, হোটেল থেকে খাবার আসছে।

এতক্ষণ গল্পের জোরে সুমন তার নিজের কথা ভুলেই গিয়েছিল। নিজের দুরবস্থার কথা মনে পড়তেই তার মন খারাপ হয়ে গেল। সে মেসের আশে পাশে দেখতে লাগলো। এখানে তার কোথায় জায়গা হবে? একটা মাত্র কামরা তার ভেতর তিনটা তক্তপোষ ফেলা হয়েছে, তিনজন লোক থাকে। ছোট একটা পাকের ঘর, পাশে একটা বাথরুম। সুমন মনে মনে ভাবতে লাগল এখানে থাকতে পারার কোন সম্ভাবনা নাই। ঠিক সেই সময় তমাল বলল, মামা একটু বাইরে চলেন দরকারী কথা আছে। সিদুকে নিয়ে ওরা বাইরে গেলো এবং তমাল বলল– মামা সুমন খুব অসুবিধায় আছে, ওর কোন থাকার জায়গা নাই। আপাতত: আপনার এখানে একটা ব্যবস্থা করতে পারেন নাকি?

তা না হলে ওর গ্রামে ফিরে যেতে হবে, তার মানে পড়াশুনার এখানেই ইতি।

– ব্যবস্থা একটাই সম্ভব তা হলো আমার সাথে ডাবলিং করা। বেশিরভাগ সময় আমার অবশ্য নাইট ডিউটি থাকে, কাজেই কিছুদিনের জন্য এমন আর কি অসুবিধা হবে? সুমন কালই তুমি চলে আস এখানে, তারপর আমরা সবাই মিলে তোমার জন্য লজিং খুঁজবো। সুমন বললো, মামা আমার জন্য আপনার অনেক কষ্ট হবে–

– আরে আমার আবার কষ্ট কি? একলা মানুষ, জীবন কোনরকম কেটে গেলেই হলো।

মেসের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ওরা কথা বলছিলো হঠাৎ একটি চমৎকার গাড়ি এসে সামনের রাস্তায় দাঁড়ালো, রাস্তার ওপাশেই একটা বাড়ি। বাড়িটার বাইরের রঙ চলে গেছে, কোথাও কোথাও ইটও খসে পড়েছে। গাড়ি থেকে দু'টো মেয়ে নামলো, তাদের হাতে বই খাতা এবং তারা ঐ বাড়িটাতে ঢুকে গেল। লাল রঙের গাড়িটা চলে গেল। তমাল ও সুমনের মুখে প্রশ্নের চিহ্ন, বুঝতে পেরে সিদু বললো ঐটি আদেল কেরানীর বাড়ি, মেয়ে দু'টিও তার, শুনেছি লালমাটিয়া কলেজে পড়ে। গাড়িটা যে কার তা অবশ্য জানি না।

– আজকে তাহলে চলি মামা, ক্লাশের শেষে কালকে সুমনকে নিয়ে আমি আসবো।

– ঠিক আছে কোন অসুবিধা হবে না, আমি সবাইকে বলে রাখবো।

পরের দিনই মেসে চলে এলো সুমন। সন্ধ্যার দিকে সে একটা টিউশনি করে, বাকি সময় তার পড়াশুনা করে কাটে। প্রথম দিকে মেসের অন্যান্যরা বেশ আপত্তি করে ছিল, সিদু তাদেরকে বুঝিয়ে বলেছে– সব সময় থাকার জন্য তো ছেলেটি আসেনি, একটা জায়গা পেলেই সে চলে যাবে। ক'দিন থাকার পর অবশ্য সবাই

তাকে পছন্দ করে ফেলেছে। সন্ধ্যায় আড্ডার সময় সুমন টিউশনি করতে যায়, সারা দিন সে বিশ্ববিদ্যালয় অথবা লাইব্রেরীতে কাটায়।

সকালের ক্লাশ ধরার জন্য সুমন খুব তাড়াহুড়া করে বের হয়ে যাচ্ছিল। ঘর থেকে বার হয়েই মেয়ে দু'টোর সামনে পড়ে গেল। তারা ওকে দেখে মুখ টিপে হাসছে। সুমন ওদিকে খুব একটা গা না করে দ্রুত বাসস্ট্যাণ্ডের দিকে হাঁটতে থাকলো। অদূরে শিশু হাসপাতালের নির্মাণ কাজ চলছে, অনেক লোক ভোর থেকে কাজ করে যাচ্ছে। কাছেই একটা চায়ের দোকান, কেউ কেউ চা খাচ্ছে।

সুমন একটা বাসে উঠে পড়লো।

ক্লাশ শেষ করে সুমন বিকেলে মেসে ফিরলো, তখনো কেউ ফিরেনি। সুমন গোসল সেরে, বারান্দায় গিয়ে পড়ন্তরোদে বসল একটা বই নিয়ে। সে বই পড়ছিল চেয়ারে হেলান দিয়ে, বিকেলের রোদ তার পেছনে।

হঠাৎ সে দেখল বইয়ের পাতায় একটি ছায়া। পেছন ফিরে দেখতে পেল সেই মেয়ে দুটোর একটি, দাঁড়িয়ে হাসছে। সুমন উঠে দাঁড়িয়ে বলল, বসুন। মেয়েটি হাসল তারপর বলল, আমার নাম রেবা আর আমার বড় বোনের নাম সেবা, আপনি বসুন।

– আমার নাম সুমন।

–আপনাকে এখানে নতুন দেখছি।

–হ্যাঁ, আমি এই কিছু দিন থাকবো এখানে।

– কোথায় পড়েন আপনি ।
–ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ।
–আপনিতো লালমাটিয়া কলেজে পড়েন, তাই না? রেবা কিছুটা অন্যমনস্ক হলো, কিছু একটা চিন্তা করলো । তারপর বললো,
– কি করে জানলেন?
–সিদু মামা বলছিলেন ।
ঠিক সেই সময় সেবা ডাকলো, 'রেবা ঘরে আয়' ।
–যাই, আমাকে ডাকছে, পরে কথা হবে ।
রেবা চলে গেল ।
বেশ কিছু দিন রেবার সাথে দেখা হয় নি । সুমনও খুব ব্যস্ত, সামনে একটা পরীক্ষা । এদিকে দেশের রাজনৈতিক অবস্থা ভীষণ খারাপ । ইলেকশনে আওয়ামী লীগ জয়ী হলেও ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা দিচ্ছে না শেখ সাহেবকে । ঢাকায় ভীষণ উত্তেজনা বিরাজ করছে । ক্ষমতা হস্তান্তর না করলে, সংঘর্ষ অনিবার্য । বাঙালিরা এবার এক হয়েছে, তারা কিছুতেই ছেড়ে দেবে না । আলোচনার পর আলোচনা চলছে কিছুই এগুচ্ছে না । সুমনদের মেসের মধ্যেও সেই আলোচনাই হচ্ছিল । রাতে সুমন মেসে ফিরেই দেখে সবাই উত্তেজিত । সুমন যে বাসায় টিউশিন করে সে বাসার ইঞ্জিনিয়ার সাহেবও আজকে একই কথা বললেন– মাস্টার সাহেব, দেশে অনেক গোলমাল দেখেছেন কিন্তু এবার যেদিকে এগুচ্ছে দেশ, দেখবেন চরম গৃহ-যুদ্ধ ।
সুমন বলল, ক্ষমতাটা শেখ সাহেবকে দিয়ে দিলেইতো আর গোলমালটা হয় না ।
ইঞ্জিনিয়ার সাহেব বললেন, আমি আপনাকে লিখে দিতে পারি, পশ্চিম পাকিস্তানিরা বিশেষ করে ভুট্টো তা কিছুতেই হতে দেবে না ।
রাতে কাজে যাবার আগে সিদু বলল, সুমন তোমার জন্য একটা ভাল খবর আছে । মনিপুরি পাড়ায় আমার জানাশুনা এক ভদ্রলোক থাকেন । তিনি তাঁর বাসায় একজন মাস্টার রাখবেন, তোমার কথা বলাতে রাজী হলেন । তার দুই ছেলে মেয়েকে তোমার পড়াতে হবে, বিনিময়ে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা হবে ।
সুমন খুশীতে উত্তেজিত হয়ে বলল, দারুণ খবর মামা, সত্যি বলছেন তো?
– হ্যাঁ, আমি কালই নিয়ে যাবো তোমাকে সে বাসায় ।

পরের দিন সকালে বাসস্ট্যান্ডে অপেক্ষা করছে সুমন । এতদিন পর একটা থাকার জায়গা পাওয়া গেছে । সে খুব খুশী, গ্রামে ফিরে যেতে হবে না, পড়াশুনাও বন্ধ হবে না । এমন সময় রেবাও এসে দাঁড়ালো ।
– ক্লাশে যাচ্ছেন বুঝি?
– না, আজকে ক্লাশ নেই, লাইব্রেরীতে যাব । আপনি কলেজে যাচ্ছেন?
– না কলেজে গোলমাল চলছিল, বন্ধ করে দিয়েছে ।
কবে খুলবে কে জানে? আমিও লাইব্রেরীর ওদিকেই যাচ্ছি, আমার একটা কাজ আছে ।
ইতিমধ্যে একটা বাস চলে এলো, কিন্তু জায়গা নেই, ওরা উঠতে পারলো না ।
বিরক্ত হয়ে রেবা বললো, চলেন রিক্সায় চলে যাই ।
– রিক্সায় অনেক সময় লেগে যাবে, আপনি যান । সুমন এগিয়ে যেতে চায় ।
– তাহলে চলেন বেবীটেক্সিতে যাই ।
– সত্যি কথা বলতে কি জানেন, আমার আছে পয়সা নেই ।
–ভাড়া আমিই দেব, একই দিকে যাচ্ছি, চলুন–
তাকিয়ে আছে সুমন রেবার দিকে-
– কি অমন দেখছেন! চলুন-
বেবীটেক্সি পাওয়া গেল না, অগত্যা রিক্সায়ই উঠতে হল ।

সুমন ভীষণ নীরব আর রেবা আলাপ জমাবার চেষ্টা করছে ।
–আপনি সারাক্ষণ পড়াশুনা করেন, এতো পড়েন কেমন করে? আর কিছু করার ইচ্ছে হয় না?
– আর কিছু মানে কি?
– যেমন খেলাধুলা, আড্ডা দেয়া, সিনেমা দেখা?
–খেলাধুলা করার সুযোগ হয়নি কখনও, আড্ডা দেয়ার সময় নেই, আর সিনেমা দেখার পয়সা নেই ।
তা আপনিও তো ছাত্রী- পড়াশুনো না করেই পরীক্ষায় পাশ করেন?
– না আমার অত পড়তে হয়না । পড়াশুনায় আমার মনই বসে না ।
–কিসে আপনার মন বসে?
আমার অনেক কাজ– সে আপনি বুঝবেন না ।
– সেই ভাল, আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে আপনি অনেক উঁচু পদের চাকরি করেন ।
সুমনের এ মন্তব্যের কোন আমল দিল না রেবা । সে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল ।
– আপনার কাছে পয়সা নেই বললেন, আপনার বাবা টাকা দেন না?
– নাঃ আমার বাবা বেঁচে নেই ।
সুমন আরও গম্ভীর হয়ে পড়ে ।
– ও!, তাহলে কে আপনাকে টাকা দেয়?
– কেউ না । আমার ব্যবস্থা আমাকেই করতে হয় ।
– কি করে?
–টিউশনি করি ।
–টিউশনি করে আপনি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েন?
–আপনি খুব অবাক হলেন দেখছি, আমার মত শত শত ছেলে আছে যারা টিউশনি করে পড়াশুনা করে ।
– আমার ঠিক জানা ছিল না ।
সুমন মনে মনে বলে, বাবার হোটেলে থাকলে জানবেন কি করে? ওদের রিক্সা সায়েন্স ল্যাবরেটরীর সামনে এসে আটকে গলে । একটা মিছিল যাচ্ছে ।

রিক্সাওয়ালা খবর নিয়ে বললো, 'সাব! সামনে আর যায়ন যাইব না, ঐদিকে সবকিছু বন্ধ অইয়া গেছে । ছাত্ররা সাদীন বাংলাদেশের পতাকা উড়াইয়া দিছে । পশ্চিমা হালার পুতেগো লগে আর কোন সম্পর্ক নাই ।'
রেবা বলল, চলেন বাসায় ফিরে যাই । গুলাগুলি হতে পারে ।
– আপনি যান । আমি একটু সায়েন্স ল্যাবরেটরীতে যাব । এখানে আমার এক বন্ধু আছে, দেখি কয়েকটা বই নিতে পারি কি না ওদের লাইব্রেরী থেকে ।
সে রিক্সা থেকে নামতে নামতে রিক্সাওয়ালাকে জিজ্ঞেস করলো, তুমি ঠিক জানো বিশ্ববিদ্যালয়, লাইব্রেরী সব বন্ধ?
রিক্সাওয়ালা– হ্যা সাব, দেহেন না কেউ যাতেছে না ওদিকে ।
সন্ধ্যার পর বাসায় ফিরে দেখলো তখনও গল্পের আসর ভালই চলছে । মনু রসিয়ে গল্প করছে আর সবাই হেসে লুটোপুটি খাচ্ছে । তাকে দেখা মাত্র সবাই নীরব । সুমন বললো কি হল আপনাদের? একেবারে নিরব হয়ে গেলেন যে । বড়দের কথাবার্তা হচ্ছে, তোমার শোনার দরকার নেই । মনু উঠে দাঁড়াল, আজকের মত চলি সিদু । মনু চলে গেল । সিদু বলল, সুমন তোমার ক্লাশ আছে কালকে?
– ক্লাশ তো ছিল মামা, কিন্তু হবে বলে মনে হচ্ছে না । সবকিছু কেমন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে । শুনেছি শেখ সাহেব অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেবেন । কি হয় বলা যায় না ।
– যাহোক তুমি বিকেলে প্রস্তুত থেকো, আমি তোমাকে মনিপুরি পাড়ায় সেই বাসায় নিয়ে যাবো ।

– ঠিক আছে মামা।
খুব ভোরে ঘুম ভেঙে গেল সুমনের। মেসের অন্য সবাই তখনও ঘুমুচ্ছে। বাইরে তখনো আধো অন্ধকার, আধো আলো, সুমন দৌঁড়াতে বের হলো। ঢাকা আরিচা রোড়ের সমান্তরাল একটা রাস্তার দক্ষিণ দিকে দৌঁড়াচ্ছে সে। রাস্তা নির্জন, দুই পাশে স্টাফ কোয়ার্টার- দৌঁড়িয়ে সে নতুন সংসদ ভবনের রাস্তায় গিয়ে পৌঁছাল। সুমনের এখন গরম লাগছে, সে আবার উত্তর দিকে হাঁটতে লাগলো।
কিছুক্ষণ পরেই হঠাৎ একটা টয়োটা গাড়ি এসে থামলো তার সামনে। ভেতর থেকে রেবা ডাকছে, আসুন, বাসায় যাবেন?
সুমন দেখলো মনুই গাড়ি চালাচ্ছে। এতো সকালে চৌধুরীর গাড়িতে রেবা কোথা থেকে আসতে পারে? তার মাথায় কিছুই খেলছে না। সে বলল,
– আপনি যান আমি হাঁটবো, বলেই সে দ্রুত হাঁটতে লাগলো। রেবা গাড়ি থেকে নেমে ওর পেছনে পেছনে হাঁটতে শুরু করলো। অগত্যা সুমনও একটু দাঁড়াল এবং দু'জন একত্রে হাঁটতে লাগল। প্রথমে দু'জনই নিরব, হাঁটতে হাঁটতে একটা সরকারি অফিসের সামনে এলো। সুমনের মনে হাজার প্রশ্ন কিন্তু সে সবই চেপে গেল। রেবা অবাক হচ্ছে সুমনের নিরবতা দেখে। অফিসের সামনে একটি ফুলের বাগান। বাগানে নানা ফুল ফুটে রয়েছে, সুমন দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। ফুল। মৃদু বাতাসে দুলছে ডালিয়া, জুঁই– যেন গানের সুর বয়ে যাচ্ছে, যেনো চাঁদের জ্যোৎস্না হাসছে।
– ফুল কি সুন্দর না?
– অপূর্ব।
– শুনলাম আপনি নাকি এখান থেকে চলে যাচ্ছেন?
– কোথায় শুনলেন?
মনু বলল।
– অ, হ্যাঁ ঠিকই শুনেছেন। আজই বিকেলে।
এবার ওরা ডান দিকে হাঁটতে লাগলো। সামনে একটা পার্ক।
– আমি ঐ পার্কে যাবো, একটু বসতে ইচ্ছা হচ্ছে।
– চলুন, আমিও বসবো।

ওরা পার্কের মধ্যে হাটতে লাগলো। সকালের শিশির ভেজা ঘাস, নানা রঙের ফুল, বেশকিছু ইউকেলিপ্টাস গাছ, তারই একটার নীচে বেঞ্চিতে বসে পড়লো ওরা।
সুমন বলল– আপনাকে বেশ ক্লান্ত লাগছে, কোন অসুখ করে নি তো?
রেবা ওর দিকে তাকিয়ে থাকলো, সে চোখে কৃতজ্ঞতা। সে চোখ বলছে ধন্যবাদ। কিন্তু মুখে কিছুই বললো না, একটু হাসলো, তারপর তার মুখ বেদনায় নীল হয়ে গেল। সুমন একটা কিছু শোনার জন্য রেবার দিকে তাকিয়ে থাকে।
– আপনার হৃদয়টি কোমল, মনটা নিষ্পাপ, আপনার আর একটি গুন আছে।
– সেটা আবার কি?
– বলছি, চলুন ঐ দিকে যাই, ওদিকে বেশি ফুল দেখা যাচ্ছে। ওরা একটা ফুলের ঝাড় সামনে নিয়ে আবার বসল। এই সকালেই মৌমাছিরা ভোঁ ভোঁ করছে ফুলের মধ্যে।
– এবার বলুন গুনটি কি?
– আপনার অসম্ভব কৌতুহল দমন রাখার ক্ষমতা।
– কিসের কৌতুহল?
– না বুঝার ভান করবেন না, প্লিজ।
– ঠিক ধরতে পারছি না।

– আপনি বলতে চান এত সকালে কোথা থেকে এলাম ঐ গাড়িতে করে তা জানার কোন কৌতুহলই আপনার নেই?
– হয়তো আছে, কিন্তু তা জেনে আমার লাভ কি? মনুর কথা থেকে আমি বুঝতে পেরেছি, খারাপ কিছু একটা আছে।
– মনু কি আপনাকে কিছু বলেছে?
– না, মনু আমাকে কিছুই বলে নি। ওরা রোজ বিকেলে আড্ডা দেয়, আমি তখন টিউশনি করতে যাই। তবে মাঝে মধ্যে শুনেছি যে, চৌধুরী খুব ভাল লোক নন। আমার কেন জানি মনে হয় আপনারও এর মধ্যে জড়িত। এসব জানার সময় ও ইচ্ছা আমার নেই। এইযে এত সুন্দর সুন্দর ফুল দেখছেন, আমি জানি এর কোন কোনটির ভেতর পোকা লুকিয়ে আছে। ফুল দেখেই আমার চোখ জুড়িয়ে যাচ্ছে, পোকা খুঁজে লাভ কি?
– আচ্ছা, কোন ফুলে যদি আপনি পোকা পান তাহলে কার দোষ দেবেন? ফুলের?
– সে বিচারে যেতে যাই না, তবে জেনে শুনে পোকা ভরা ফুলটা আপনিও কি মাথায় গুঁজবেন?
খুব দুঃখ পেল রেবা। ব্যাথাতুর দৃষ্টিতে সে শুধু চেয়ে থাকলো সুমনের দিকে। সুমন শুধু অনুমান করতে পারে, ব্যাপারটা ঠিক বুঝে ওঠতে পারে না। সে পরিস্থিতি হালকা করার জন্য বলল - এসব কথা থাক, আজই আমি চলে যাবে এখান থেকে, এই যে আপানার সাথে আলাপ হলো, কথা হলো, ভালো লাগলো এ টুকুই আমার মনে থাকবে।
– আপনি আমাকে চেনেনে না তাই। জানলে আপনি আমাকে ঘৃণাই করবেন।
– আমি কোন মানুষকেই ঘৃণা করি না। আপনিও আমাকে চেনেন না। অচেনা থাকাই ভাল, ... চলুন ওঠা যাক রোদ বেড়ে যাচ্ছে।
সেদিন বিকেলেই সিদুর সাথে সুমন চলে গেল মনিপুরি পাড়ায়। যাওয়ার পথে সে বলল– মামা আজকে আদেল কেরানীর মেয়ে রেবার সাথে অনেক কথা হল।
– সর্বনাশ, কোথায়?
– খুব সকালে দেখলাম সে মনুর গাড়িতে করে কোথা থেকে এলো।

– খবরদার। ওদের সাথে মিশবে না। তোমাকে আগেই জানানো উচিৎ ছিল। রেবা ও সেবা কলেজে পড়ার ভান করে, আসলে ওরা কলগার্ল।
– বলেন কি?
হ্যাঁ, ঐ ব্যাটা আদেল কেরানি একটা জঘন্য লোক। চৌধুরীর একটা অফিসে কাজ করে আর হারামজাদা মেয়েদের দিয়ে ব্যবসা চালায়। যে বাড়িতে থাকে ওটাও চৌধুরীর। চৌধুরীর একটা ক্লাব আছে বনানীতে। সেখানে নানা ধরনের লোকজন এসে আড্ডা দেয়, তাস খেলে, আর যত কুকাম আছে সব করে।
– আপনি এত সব জানেন কেমনে?
–মনুর কাছ থেকে, ওতো ড্রাইভার ও সব জানে। রেবা হয়তো ওখান থেকেই ফিরেছে সকালে। মাঝে মধ্যে ওদেরকে বড়লোকদের বাসায়ও পাঠিয়ে দেয়।
–মামা কি বললেন! বাপ হয়ে এমন জঘন্য কাজও কেউ করতে পারে? রেবার সাথে কথা বলে মনে হল মেয়েটি ভাল– বলেছিল, 'জানতে পারলে আপনি আমাকে ঘৃণাই করবেন'।
– মেয়েগুলোর কোন দোষ না, বাপটাই পাজি, শয়তানের হাড্ডি।

সুমন ঢাকায় ফিরলো প্রায় নয় মাস পর, পাকাবাহিনীর আত্মসমর্পনের পর। দেশ এখন স্বাধীন, সর্বত্র বাংলাদেশের পতাকা উড়ছে। ইতিমধ্যে কত কি না ঘটে গেছে। মার্চের সেই বিভীষিকা রাতে, মনিপুরি পাড়া থেকে হেঁটে, রায়ের বাজার হয়ে গ্রামে চলে গিয়েছিল। কিন্তু শান্তিবাহিনীর দালালদের জ্বালায় সে গ্রামেও

থাকতে পারেনি। পালিয়ে সে ভারতে চলে গিয়েছিল, সেখানে একটি ক্যাম্পে ছিল বেশ কিছু দিন। তার ভাল লাগেনি সেখানেও, একদিন সে আবার বাংলাদেশে ঢুকে পড়ল, তখন চতুর্দিকে যুদ্ধ চলছে। ঢাকার দিকেই আসছিল সুমন, আরিচার কাছে এসেই একদল পাকিস্তানি সেনার হাতে ধরা পরে গেল। তাকে এবং আরও অনেককেই একটি ক্যাম্পে নিয়ে বন্দী করে রেখেছিল। পাকিস্তানি সেনারা অকল্পনীয় অত্যাচার করতো ওদের উপর। একেক রাতে একেক জনকে ক্যাম্প থেকে ধরে নিয়ে যেতো, কাউকে আর ফিরতে দেখেনি সুমন। সে ও ভেবেছিল তারও জীবনের এখানেই শেষ।
এক রাতে তাকেও চোখ বেঁধে ধরে নেয়া হল। সুমন আল্লাহ আল্লাহ করছিল।
সে একেবারে নিশ্চিত যে তার জীবন এখানেই শেষ। একজন অফিসারের সামনে নিয়ে তার চোখ খুলে দেয়া হল। তাকে জিজ্ঞাস করলো–
তোর মুকুত হ্যায়? সুমন মাথা নেড়ে ইশারায় বলল না। তোম মালাউন হ্যায়? সুমন আবার বলল না। তখন একজন সৈন্যকে হুকুম করলো সুমনের কাপড় খুলে ফেরতে। সুমন সে অন্তিম মুহূর্তে কি করবে ঠিক বুঝে ওঠতে দাঁড়িয়ে খুব জোরে সুর করে পড়তে শুরু করল, ইয়া নবী সালামুআলায়কা... ইয়া রাসুল সালামু আলায়কা... সব পাকিস্তানি ভন্ডরা তার সাথে সাথে নামাজে দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে পড়তে লাগলো, ইয়া নবী সালামুআলায়কা... ইয়া রাসুল সালামুআলায়কা...। শেষ হলে পরে সুমন একটি মুনাজাতও করে ফেলল। অবস্থা দেখে তার মনে কিছুটা ভরসা পেল, এ যাত্রায় সে বেঁচেও যেতে পারে। তাই হল। অফিসারটা ওকে ডাবের জল আর বিস্কুট খেতে দিল। তারপর জিজ্ঞেস করলো কোথায় যাবে সে?
সুমন বললো - মানিকগঞ্জ।
– তোম যাও, সুমনকে ছেড়ে দিল।
অফিসারটা কি ভাল লোক ছিল? সুমন তা আজও জানে না। পাক সেনারা তাকে অনেক বার ধরেছে, আবার বেঁচেও গেছে। একবার সে ঢাকা আরিচা রোড দিয়ে বাসে যাচ্ছিল, সাভার রেডিও স্টেশনের কাছে আসতেই বাস থামিয়ে, পাক সেনারা সব যাত্রীদের নামিয়ে লাইন করে দাঁড় করালো। সুমন ভাবলো এখনই গুলি করবে। অবাক ব্যাপার ঘটলো, একজন সৈন্য, সে অফিসার ছিল কিনা সুমন জানে না। অতসব খেয়াল করার সময় কই, সবাই তখন মৃত্যুর কথা ভাবছে। সুমনের সামনে এসে লোকটা তাকে ভাল করে দেখছিল, তর্ তর্ বুক তখন টিপ টিপ করছিল। তারপর সৈন্যটি বলল, তোম হট যাও। সুমন বিশ্বাস করতে পারছে না, সে কি করবে বুঝতেও পারছে না। সে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে ছিল, আর তখন সৈন্যটি জোরে বলল, আরে বাঙাল কা বাচ্চা তুম কেয়া দেখ রেহে হো, বাস মে চড়হো। সুমন যেয়ে বাসে উঠলো, আরও কয়েক জনকে ছেড়ে দিল, বাসটাকেও যেতে দিল, বাকিদের কি হল সুমন জানে না।
সুমন মানিকগঞ্জ এসে এক আত্মীয়ের বাসায় উঠলো। এমনি করে ছুটাছুটি করেই সে নয় মাস কাটিয়ে দিল। ঢাকায় এসেই সে তমালদের বাসায় গেল। তমাল ওকে দেখেই জড়িয়ে ধরলো– আমি ভেবেছিলাম তোকে আর দেখবো না। কোথায় ছিলি এতদিন?
সে অনেক কথা, তোরা সবাই ভাল আছিস?
– আমরা সাবই ভাল, অনেক বন্ধুরা আর নেই। অনুপ, দিলু, সাইফুল– ওদেরকে ধরে নিয়ে পাক বাহিনীর লোকেরা মেরে ফেলেছে।

– বলিস কি? অনুপও শহীদ হয়েছে? সিদু মামার খবর কি?

– মামা ভালই আছেন। মনিপুরি পাড়ায় তুই যে বাসায় ছিলি, মামা তার পাশের বাসায় ভাড়া করে থাকেন। সেই মেসে আর কেউ থাকে না এখন।
– কেন?

– যুদ্ধের মধ্যেও ওরা ছিলেন। তবে এক রাতে পাক বাহিনীর লোকেরা এসে রেবা ও সেবাকে ওদের বাপ-মার সামনেই ধর্ষণ করে।
– অহ্ গড, বলিস কি? ভুরু কুঁচকে যায় সুমনের।
– সিদু মামা দরজার ফাঁক দিয়ে সব ঘটনা দেখেছেন আর ভয়ে একেবারে কাঠ হয়ে গিয়ে ছিলেন। মামারা পরের দিনই ওখান থেকে পালিয়ে ছিলেন। কিন্তু আদেল কেরানীর কোথাও যাওয়ার জায়গা ছিল না। ওনি চৌধুরীর কাছে গেলেন আর চৌধুরী তখন পাক বাহিনীর দালালী করছিল। সে মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে ছিল আদেল কেরানীকে। সে রাত্রে পাক পশুরা এসে রেবা ও সেবাকে ধরে নিয়ে যায়, তাদের আর কোন খবর নাই। চৌধুরী মুক্তি বাহিনীর হাতে ধরা পড়ে এবং স্বীকার করে, এসব তারই কাজ। মুক্তি বাহিনীর লোকেরা তাকে গুলি করে মেরেছে।
– ভাল করেছে, মনুর খবর কি?
- সে নাকি পালিয়ে দেশে চলে গেছে।
– রেবা-সেবা বেঁচে আছে কি না কোথাও কেউ জানে না?
– ঠিক কেউ বলতে পারবে না। ওরা চৌধুরীর যে বাড়িতে থাকতো, সেটা মুক্তি বাহিনীর লোকেরা দখল করেছিল। রেবার বাবা-মা এখন কোথায় থাকে তাও কেউ জানে না।
জীবন যাত্রা আবার স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। সুমন আবার পড়াশুনা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। যে কোন এক সকালে হাঁটতে হাঁটতে সেই পার্কটিতে গেল। অদূরে সেই সরকারি অফিসটির সামনে এখন বাংলাদেশের পতাকা উড়ছে। সুমন সেই একই জায়গায় বসে রেবার কথা ভাবতে লাগলো। রেবা বলেছিলো, 'কোন ফুলে যদি আপনি পোকা পান তাহলে কার দোষ দেবেন?'
সুমন একবার ফুলের দিকে তাকায় আর একবার পতাকার দিকে – তারপর মনে মনে বলে – রেবা, তোমার মত অসংখ্য ফুলের আত্মহুতির বিনিময়েই ঐ পতাকাটি উড়ছে – তোমাদেরকে যেন আমরা ভুলে না যাই।

দেওয়ান সৈয়দ আবদুল মজিদ

বিমূর্ত্ত শব্দগুলো

অনেক দিনের পরে, কবিতা লিখতে বসে
ভাবনায় ভাষাগুলো কেমন যেন এলোমেলো।
নূতন শব্দার্থ খুঁজি অভিধানের পাতা চষে চষে
কী যে বিভ্রাট... অদ্ভুত অর্থবোধক এ বিমূর্ত্ত শব্দগুলো।

'রাজনীতি'র মানে খুঁজে খুঁজে গলদঘর্ম আমি
সত্য-ন্যায়ের কণ্ঠ কোথায়? চারিদিকে শুধু অসুরের গান।
নীতি তার আজ সন্ত্রাস-প্রীতি, ভণ্ডের ইতরামি
মিথ্যাচারের চাবুকে লুটায় অসহায় জনতার প্রাণ।

তিন দশকের আশা-নিরাশার শীত-তাপ সহে
স্বাধীনতা আজ বিস্মৃত স্মৃতি, নীরব অশ্রুজল।
দেশদ্রোহের কালিমা ছড়িয়ে মুক্তিকামীর দেহে...
বিকৃত সুখ উল্লাসে নাচে রক্তচোষার দল।

শপথের ধ্বনি মূর্চ্ছিত আজ বোবা কান্নার স্বরে
ভোরের আলোর আশায় আছি–আঁধার ঘুচিবে কবে?
জীর্ণ-মলাট ধূসর পাতার অভিধান ছিঁড়ে ছিঁড়ে
কবিতার এ বিমূর্ত্ত শব্দগুলো নূতন সাজাতে হবে।

হীরক এবং জ্যোতির আর্কেটাইপ সংস্কৃতিতে বাংলাদেশ

দেওয়ান শামসুল আরেফীন

জনৈক সমাজতত্ত্ববিদের মতে, সংস্কৃতি হচ্ছে What we are| রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সংস্কৃতির উপমা হিসেবে হীরকখণ্ডের বিচ্ছুরিত জ্যোতির কথা বলেছেন। সংস্কৃতির উৎস এবং অংশ থেকে হীরকখণ্ডের প্রাধান্যকে গৌণ বিবেচনা করেছেন। স্বভাবতই দেখা যাচ্ছে সমাজবিজ্ঞানের পরিধি, দৃষ্টিভঙ্গি এবং সংজ্ঞায় সংস্কৃতির তাৎপর্য এবং ব্যাপ্তি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংজ্ঞায়িত ধারণার চেয়ে ব্যাপক এবং ব্যাখ্যাধর্মী। সমাজের সবচেয়ে বেশি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বিশেষজ্ঞ যে গোষ্ঠী সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনা, পর্যালোচনা করেন তারা হলেন নৃতত্ত্ববিদ। নৃতত্ত্ববিদদের সহজ সংজ্ঞায় সংস্কৃতি হচ্ছে সময়, স্থান এবং ভৌগোলিক পরিবেশের নিরিখে বিশেষ জনগোষ্ঠীর সার্বিক 'পরিচিতি জ্ঞাপক' অবস্থান। নৃতাত্ত্বিক এবং সমাজতত্ত্ববিদ এ বিষয়ে একে অপরের নিকটবর্তী। এরা বলেন, মানুষ সংস্কৃতি সৃষ্টি করে এবং পরক্ষণে সংস্কৃতি মানুষকে সৃষ্টি করে। স্রষ্টা অসন্তুষ্ট হয়, ক্ষুব্ধ হয় কিন্তু করার কিছুই থাকে না। সৃষ্টি স্রষ্টাকে শুধুমাত্র প্রভাবিত করে না, তাকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং তার গন্তব্য নির্দিষ্ট করে দেয়ার ব্যাপারেও সচেষ্ট হয় (Sigmund Freud: Civilization and its Discontents)। নিজের তৈরি জালে মাকড়সা যেমন আটকে পড়ে, ঠিক তেমনি। মাকড়সার স্বকীয়তা হরণ করে ঐ মাকড়সার জাল; এবং বাস্তবে ঐ জালকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয় তার জীবন।

এ কথা সত্য, মাকড়সার জাল বুননে চারুশিল্পের প্রতিফলন এবং সৌকর্য বর্তমান কিন্তু এটাও সত্য যে, মানুষের সংস্কৃতি বিনির্মাণের তাড়না এবং পদ্ধতির সঙ্গে এর গুরুতর এবং মৌল পার্থক্য রয়েছে। ঊর্ণনাভ বা পাখির নীড়ের অনন্য বৈশিষ্টতা এবং পাখির ওড়ার ক্ষমতার মেকানিক্যাল দক্ষতা আমাদেরকে বিস্মিত করে–কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হলো এই যে, এর সবই হচ্ছে সহজাত প্রক্রিয়ার অংশবিশেষ। মানুষের সংস্কৃতি নির্মাণ প্রক্রিয়াটি কিন্তু মোটেই সহজাত নয়, তা মূলত অভিজ্ঞতালব্ধ, আহরিত এবং অর্জিত, এবং অবশ্যই সময়সাপেক্ষ।

বিশ্বের জনগোষ্ঠীর যে যেখানেই থাকুক না কেন যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন সহজাত প্রবৃত্তিকে সংযত করে, পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রাম অথবা সমন্বয় সমঝোতা করে জীবনকে গতিময় এবং চিরঞ্জীব করায় তার অব্যাহত প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিই হচ্ছে এই সংস্কৃতি। ই. বি. টাইলর, র‍্যাডক্লিফ ব্রাউন, মালিনোস্কী, ফ্রেস্রার, মার্গারেট মিড, ম্যানচিপ হোয়াইটসহ অপরাপর নৃতাত্ত্বিকরা যে কথাটি সম্ভবত বলতে চেয়েছেন সেটি হলো–প্রাণী জগতের অন্যান্য জীব সাংস্কৃতিক জীব নয়-একমাত্র মানুষই (Homosapines) হচ্ছে সাংস্কৃতিক জীব। তারা বলছেন, মানুষ সাংস্কৃতিক জীব হবার পেছনে যে কারণটি কাজ করছে, সেটি হলো 'মানুষ Extracorporeal', 'Super-organic' শরীরোর্ধ্ব, অতিজৈবিক প্রাণী'। সহজাত প্রবৃত্তি উত্তরণ ক্ষমতাসম্পন্ন জীব। একটি কুকুর বা নিষ্প্রাণ এক টুকরো কাগজকে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের চূড়া থেকে নিক্ষেপ করা হলে তা মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে অনিবার্যভাবে মৃত্তিকাভিমুখী হবে।সজীব কুকুর এবং নিস্প্রাণ কাগজের মধ্যে কোনো প্রকার ব্যত্যয় ঘটবে না। এটাই সত্য। নিক্ষিপ্ত আইনস্টাইনের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হবার

নয়। এ ঘটনাক্রমে অজৈব এবং জৈবের মধ্যে পার্থক্য নেই। উভয়েই এক নিয়ম বা শক্তির দাস। অথচ আমরা জানি মানুষ বিভিন্নতর পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং পরিশীলনের মাধ্যমে আজ নভোচারী হতে পেরেছে। মানুষ বিহঙ্গের মতো শূন্যে ভাসতে সক্ষম হচ্ছে; আকাশকে জয় করে সেটাকে তার প্রয়োজনে ব্যবহার করছে। রাশিয়ার নভোচারী কুকুর স্ট্রেল্কা এবং বেল্কা লব্ধ অভিজ্ঞতা তাদের পরবর্তী প্রজন্মের জন্যে প্রবাহিত রেখে গেছে এমন প্রমাণের সাক্ষাৎ বিজ্ঞানীরা পেয়েছে বলে এখন পর্যন্ত শোনা যায়নি। স্বাভাবিকভাবেই সংস্কৃতি বিনির্মাণের কাজটি মাকড়সার জাল তৈরির মতো সহজ নয়। যে সমস্ত বস্তুগত কারণে মানুষ সাংস্কৃতিক জীব হতে পেরেছে তার একটি ফর্দ তৈরি করেছেন Man Makes Himself গ্রন্থের প্রণেতা গর্ডন চাইল্ড। এতে রয়েছে তার Brain এর আনুপাতিক বৃহদাকার আকৃতি এবং ব্যবহারিক ক্ষমতা চতুষ্পার্শীয় দৃষ্টিশক্তি (Stereoscopic Vision),অস্ত্র এবং যন্ত্রপাতি বানানোর ক্ষমতা, আন্তঃসম্পর্ক প্রতিষ্ঠাকারী ভাষা এবং এক সময়ের লব্ধ জ্ঞান, দক্ষতা অভিজ্ঞতা এবং সময়ান্তরে-পরবর্তী প্রজন্মে প্রবাহিত বা সঞ্চালিত রাখার ক্ষমতা। যেখানে বিপুলাকায়, শক্তিধর, হিংস্র বহু জীব বিশ্ব বিবর্তনে বিলুপ্ত হয়ে গেছে, সেখানে উল্লিখিত কারণে তুলনামূলকভাবে অসহায় জীব মানুষের অগ্রযাত্রা অপ্রতিরোধ্য অব্যাহত রয়েছে। এ তো গেল বিশ্বমানব সংস্কৃতির বিবর্তনের অপেক্ষাকৃত কম জটিল অংশটুকুর আলেখ্য। এই ব্যাখ্যা এক অর্থে Archaic বা প্রাচীন। Golden Bough খ্যাত নৃতাত্ত্বিক ফ্রেজারের ভাষায় এটাকে সংস্কৃতি এবং সাংস্কৃতিক বিবর্তনের Archetype বলা চলে। হেনরি লুই মর্গান এবং প্রগতিবাদী সমাজসংস্কৃতিবেত্তা কার্ল মার্কস এবং ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের মতে ব্যক্তিগত সম্পত্তি এর উন্মেষের পর থেকে আর সংস্কৃতির Archetype ঐতিহ্যগত অর্থে রক্ষিত হয়নি। সময়ান্তরে ব্যক্তিগত সম্পত্তিভিত্তিক, শ্রেণী বৈষম্যকেন্দ্রিক স্বার্থ সার্বজনীন সংস্কৃতির বিবর্তনের জায়গা দখল করে নিয়েছে এবং তার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার পর রুদ্ধ করার প্রয়াস পাচ্ছে। Archetype এর পূর্ণ তিরোধান ঘটেছে তা নয়, সেটা রয়েছে তবে তা 'বাই প্রডাক্ট' হিসেবে।

সংস্কৃতির রূপরেখা মূলত নির্ধারিত এবং নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে সমাজের পুঁজির মালিক বা পুঁজি নিয়ন্ত্রণকারী শ্রেণীর দ্বারা কি আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে, কি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে। সাম্প্রতিক ইতিহাসে উপনিবেশবাদ বিশ্বের সংস্কৃতির স্বাভাবিক সাবলীল বিবর্তনকে দুমড়ে মুচড়ে ফেলেছে। বিশ্বের অধিকাংশ অঞ্চলে এর অনুপ্রবেশ এতটা গভীর এবং দৃঢ়মূল হয়েছে যে আরোপিত সংস্কৃতি বা জীবন পদ্ধতিকে এসব অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর বৃহত্তম একটি অংশ পরের বলে ভাববার ক্ষমতা পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছে। স্বদেশী এবং পরদেশী সংস্কৃতির ভিন্নতা উপলব্ধি করার মতো চেতনারও প্রকট অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। ফ্রাঞ্জ ফেনন (Franz Fannon) বলেন, তৃতীয় বিশ্বটা যেন পূর্বতন ঔপনিবেশিক শক্তিসমূহের ট্রান্সমিশন বেল্টে পরিণত হয়েছে। তারা সার্থকভাবে রাষ্ট্রযন্ত্রে, পথে-ঘাটে, বন্দরে, শিক্ষায়তনে, ব্যবসা-বাণিজ্যে, সচিবালয়ে, এমনকি উপাসনালয়ে রেখে গেছে সুদৃঢ় স্থানীয় পাহারাদার। 'বেওয়াচ' যেমন দেশের সংস্কৃতির ওপর মোড়লিপনা করছে, একই সঙ্গে তা বেওয়ারিশ করছে স্বকীয় Archetypical সাংস্কৃতিক সত্তাকে। ওয়াশিংটন এবং নিউ ইয়র্কের অভিজাত হোটেলে প্রতি প্লেট হাজার ডলারের নৈশভোজে গ্রন্থিত হচ্ছে 'গরিবি হটাও'- এর এক অদ্ভুত সংস্কৃতি। প্রসঙ্গত, উপমহাদেশের কথা স্মরণ করা যেতে পারে। ১৮৭৯ এ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত যে উপনিবেশী অর্থনীতিভিত্তিক সংস্কৃতির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিল– সেই ভিতের ওপর বেড়ে ওঠা শোষণ এবং বৈষম্যমূলক পশ্চিম-নির্ভর সমাজ এবং শ্রেণীর সাংস্কৃতিক বিভিন্ন এনজিও এবং গ্রামীণ ব্যাংক প্রকল্প আঁটসাঁট করে বাঁধবার চেষ্টা করছে। এমতাবস্থায় সার্বজনীন সংস্কৃতি বা মানবতার সংস্কৃতি পুনরুদ্ধারের কাজটি দুরূহ হয়ে দাঁড়িয়েছে। রবীন্দ্র মতে, সংস্কৃতি হিসেবে জ্যোতিটুকু হয়তোবা পাওয়া সম্ভব হচ্ছে-সমাজতাত্ত্বিক-নৃতাত্ত্বিক সংস্কৃতির হীরকখণ্ড এবং জ্যোতি-এ দু'টোকে একত্রে পাওয়া দুষ্কর হয়ে দাঁড়িয়েছে।

দিলারা হাশেম

শাখা মৃগের মৃগয়া

অবতারণা

নামটা পড়ে অনেকেই হয় তো একটু অবাক হয়ে ভাবছেন 'এ আবার কেমন নাম?'

নামটা একটু উদ্ভট স্বীকার করে নিয়েই বলছি নামটি উপযুক্ত বটে। কেন, তার ব্যাখ্যা দিলেই বুঝতে পারবেন আমার মাত্র সাত বছর বয়সে শিশুকাহিনী 'কাকতালীয়' শেষ করে দেবার পর থেকে কেটে গেছে বহু বছর। বহু তাগিদ পেয়েছি পাঠকদের কাছ থেকে পরবর্তীর জন্য। অভিযোগ ও খোঁচাও এসেছে মেয়ে হয়ে আত্মকাহিনী লিখতে গিয়ে আমি হোঁচট খেয়ে থেমে গেলাম কিনা? আমার পরবর্তীর সব কথা স্বচ্ছ ভাবে লেখার সাহস আছে কিনা ইত্যাদি। তাদের খোঁচা বা অভিযোগ হজম করে দীর্ঘ দিন এ বিষয় চুপ থাকলেও ভেতরে ভেতরে স্কুল জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা – যাতে লুকোবার মত, বা রগরগে কিছু উপদান না থাকলেও আরো লেখার এবং নিজের ছোট বেলার কাহিনী উপস্থাপনের আকাঙ্খা আমাকে বহুদিন থেকেই তাড়িত করেছে।

বাহাত্তর সালের শেষ থেকে আমেরিকাতে বসবাস শুরু করার আগেই তদানীন্তত পূর্ব পাকিস্তানে আমার প্রথম উপন্যাস 'ঘর মন জানালা' প্রকাশিত হবার পর পরই উপন্যাসটি নিয়ে পাঠক সমালোচক মহলে যথেষ্ট হৈ চৈ হয় তা স্বীকার করতে দ্বিধা নেই। সেটিই বাংলাদেশের প্রথম উপন্যাস যা চীনা ভাষায় অনুদিত হয়, এবং সেটিই প্রথম বাজারে চালু জনপ্রিয় উপন্যাস হিসেবে চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়। সেটি ছিল চিত্র নায়িকা কবরীর প্রথম প্রযোজনা – তাঁর প্রযোজিত সেই চলচ্চিত্র পরিচালনা করেছিলেন সুভাষ দত্ত এবং নায়ক নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন কবরী ও উজ্জ্বল। উপন্যাসটি আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক শহীদ মুনীর চৌধুরীর অকুণ্ঠ প্রশংসাও পেয়েছিল তখনকার 'বই' পত্রিকায়। আদমজী সাহিত্য পুরস্কারের জন্যে মনোনীতও হয়েছিল।

ধান ভাঙতে শিবের গীত বা আত্মপ্রচারের জন্যে কথা গুলো বলছি না – ঘটনাগুলো তথ্য হিসেবে উল্লেখ করছি এ কারণে যে, অল্প বয়সে লেখা সেই প্রথম উপন্যাসে এতটা সাফল্য আমাকে সাহিত্যিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করলেও জীবনের কঠিন ধাক্কায় করাচি থেকে ছিটকে লন্ডন এবং সেখান থেকে আমেরিকায় এসে পড়ার পর সেই সাফল্যের জের ধরে রাখার অদম্য আকাঙ্খা থাকা সত্বও নতুন দেশে ঠাঁই করার প্রাথমিক সংগ্রামে সেই আকাঙ্খা কিছু মাত্র বাস্তবায়িত করার সময় করে উঠতে পারিনি।

অর্থাৎ অনেক দিন কিছুই লেখা হয়ে ওঠেনি।

ভাগ্য দূর্বিপাকে এবং ভয়েস অফ আমেরিকার অসঙ্গত, অন্যায় আচরণে - লন্ডনে 'বি বি সি' তে কর্মরত অবস্থাতে এখানে আসার আগে পূর্ণ সময় চাকরির জন্যে পরীক্ষায় বসা এবং তাতে সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ

হয়ে একটি সবুজ কার্ড হাতে আমেরিকায় আসার পরও - উনিশ শো পঁচাত্তরে আমার ভয়েস অফ আমেরিকার আংশিক সময় চাকরিটি খারিজ হয়ে যায় ।
অর্থাৎ আমি বেকার হয়ে পড়ি । আর সেটিই হয় শাপে বর । মরিয়া তাগিদে নতুন করে লেখা শুরু করি ।
চুয়াত্তরের বন্যা, দূর্ভিক্ষ ও দুঃসময় ভিত্তি করে রচিত এক দিনের কাহিনী ‘একদা এবং অনন্ত’ উপন্যাসটি প্রকাশিত হবার পরই আমি ‘বাংলা একাডেমী’ সাহিত্য পুরষ্কার পাই উপন্যাসের ক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতিতে । এর পরই প্রকাশ পায় দেশ বিভাগ ভিত্তিক কোলকাতার পটভূমিতে রচিত উপন্যাস ‘স্তব্ধতার কানে কানে’ । সেই উপন্যাসটিও সুধী মহলে সমাদৃত হয় । এর পর প্রকাশিত হয় আমার শৈশব কাহিনী উপন্যাসের আঙ্গিকে রচিত – ‘কাকতালীয়’ ।
প্রত্যেক লেখকেরই শিশু বয়স, তার পারিবারিক পরিবেশ তার ভবিষ্যৎ জীবনের পথ বেঁধে দেয় । আমার জীবনের সে অভিজ্ঞান এবং লেখক হবার জন্যে যেসব উপদানে আমি শৈশবকালে সমৃদ্ধ হই – তাকেই আমি লিপিবদ্ধ করি ‘কাকতালীয়’ উপন্যাসে ।
‘বিচিত্রা’ ঈদ সংখ্যায় প্রথম খন্ড ছাপা হবার পর আমি অসংখ্যা চিঠি পাই পাঠকদের কাছ থেকে পরবর্তীয় লেখার তাগাদা দিয়ে ।
পরপর তিন খন্ডে ‘কাকতালীয়’ সমাপ্ত হবার পর যখন মুক্তধারা তা বই আকারে প্রকাশ করে তখন পাঠক নয়, সম-সাময়িক লেখকদের কেউ কেউ আমাকে খোঁচা দিলেন – ‘এত তাড়াতাড়ি আত্মজীবনী লিখতে গেলেন কেন? বিষয় বস্তুর অভাব হল নাকি?’
আমি তাদের কোন জবাব দিইনি কিন্তু তাঁরাই জবাব দিয়েছিলেন অবিলম্বে । অর্থাৎ তাদের অনেকের মধ্যেই আত্মকাহিনী লেখার ধূম পড়ে যায় । সে যাক সম্প্রতি ‘কাকতালীয়’ সম্পর্কে একজন পাঠিকার চিঠি পাই ঢাকা থেকে । সাঈদা নামে সেই পাঠিকার পত্র আমাকে শেষ পর্যন্ত ‘কাকতালীয়’র পরবর্তী পর্যায় হাজির করার জন্যে বাস্তবিকই একটা বিরাট ধাক্কা দেয় । তিনি লিখেছিলেন তিনি যখন প্রথম ‘কাকতালীয়’ পাঠ করেন তখন ছিলেন ক্লাস ফাইভ অর্থাৎ পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রী । তিনি ‘কাকতালীয়’ পড়ে এত মুগ্ধ হন যে পরে ঐ বই অনেককে কিনে উপহার দিয়েছেন ও পড়িয়েছেন আর অহরহ খোঁজ করেছেন এর পরবর্তী লিখেছি কিনা । বলা বাহুল্য তাঁকে বিফল মনোরথ হতে হয়েছে । তিনি শেষ পর্যন্ত ভয়েস অফ আমেরিকার বাংলা সার্ভিসের ইকবাল বাহার চৌধুরী যখন ঢাকা যান তখন তার হাতে আমাকে ঐ চিঠি পাঠান । তিনি লিখেন তাঁর কন্যা এখন ক্লাস ফাইভের ছাত্রী এবং সে এখন ‘কাকতালীয়’ পড়ছে ।
তাঁর চিঠি পেয়ে যেন প্রথম টের পেলাম এতগুলো দীর্ঘ বছর পার হয়ে গেছে, আর বিলম্ব করা একেবারেই চলে না । স্মৃতি ক্রমশঃ আবছা হয়ে যাচ্ছে । যদিও স্কুল জীবনটা সোনার হরিনের মত থেকে থেকেই উচ্চকিত করে যায় । ইতিমধ্যে উপন্যাস, নাটক, কবিতা, ছোট গল্প লেখা হয়েছে প্রচুর । গত কয়েক বছর প্রতিবছরই নতুন বই প্রকাশিত হয়েছে বই মেলাতে, কিন্তু ‘কাকতালীয়’ যেখানে থেমেছিল তার পরে আর এগোয়নি ।
‘কাকতালীয়’ যেখানে শেষ হয় সেখানে সিরাজগঞ্জ থেকে বদলী হয়ে আব্বা-আম্মা আমাদের নিয়ে বরিশালে রওনা হয়েছেন । সেই আমাদের শেষবার ‘রেলগাড়ি ঝমাঝম’ করে রেল যাত্রা । বরিশালে যাবার জন্যে তখন ছিল একমাত্র স্টীমার ।
বরিশালে পাঁচ ছয় বছরের যে অভিজ্ঞতা তার সাথে আমি গোটা জীবনের অভিজ্ঞতারও কোন তুলনা খুঁজে পাইনা । সে অভিজ্ঞার মধ্যে প্রধান ছিল সদা শীর্ষ স্থানের খোঁজে আমার অস্থির প্রয়াস ।

সংসারে বোনদের মধ্যে সব চাইতে ‘অসুন্দর’ বলে সদা-সর্বদা হেনস্থা শুনতে শুনতে আমার জিদ চেপে গিয়েছিল, রূপ আমার চাইনে, আমার অন্যান্য গুণ (অথবা গুণাগুণকে) শানাতে হবে যাতে কেউ আমাকে পেছনে ঠেলে দিতে না পারে । তার ওপরে বরিশালে সদর গার্লস স্কুলে ভর্তি হবার সাথে সাথেই কনুই গুঁতো খেতে হল প্রচুর । সুতরাং সেই জিদ হল আরো প্রবল ।

ওরা কনুই গুঁতো দিলে কি হবে আমি ওপর থেকে ওপরে চড়ার চেষ্টায় যেন অমানুষিক (নাকি জন্তু সুলভ) ক্ষিপ্রতা অর্জন করে উচ্চ থেকে উচ্চতর শাখায় বিচরণ করা শুরু করলাম। বুঝতেই পারছেন যে জন্তুটির গুন নয় গুণাগুন আমি অচিরেই অর্জন করলাম – সেটি হচ্ছে শাখা থেকে শাখায় বিচরণকারী ‘শাখা মৃগ’ অর্থাৎ বাঁদর। বাঁদরামিতে ওস্তাদ হয়ে স্কুলে নজর তো ঠিকই কাড়লাম কিন্তু আমার চলার পথটি খুব সুগম হল না। কত রকম শাস্তি যে আমার কপালে জুটল সে কথা না হয় পরেই শুনবেন – অর্থাৎ ‘শাখামৃগের মৃগয়া’তে পড়বেন। অসংখ্য এ্যাডভেঞ্চারে সে কাহিনী পরিপূর্ণ। তার সেই সব এ্যাডভেঞ্চার কেই আমি ‘মৃগয়া’ বলে বর্ণনা দিচ্ছি।

আসুন তাহলে শুরু করা যাক।

(এক)

বিশাল ড্রিল শেডটা ভর্তি মেয়েরা হাঁটু গেড়ে বসে হাত জোড় করে সমস্বরে গাইছে -

জয় জয় রঘুপতি রাঘব রাজা রাম

পতিত পাবন সীতা রাম।

আমি, সুলতানা তার ফরিদা পাশাপাশি বসে মহানন্দেই সেই গানে সুর মেলাচ্ছি। সে গানের কথা কার–কি কার জন্য নিবেদিত হচ্ছে তা নিয়ে আমাদের মাথা ব্যথা নেই। সুরটা চমৎকার এটুকু মনে আছে।

তা ছাড়া ভালো লাগালাগির প্রশ্ন নেই। উনিশশো পঁয়তাল্লিশ সালে বরিশাল সদর গার্লস স্কুলের সব মেয়েদেরই দিন শুরু করতে হত ঐ গানটা গেয়ে। আমি আর ফরিদা আব্বা সিরাজগঞ্জ থেকে বদলি হয়ে বরিশালে আসার পর সেদিনই ভর্তি হয়েছি ক্লাস ফাইভে। ফরিদার চাইতে বছর খানেকের বড় হলেও অঙ্কে আমার এমনই কাঁচা অবস্থা যে ফরিদার সাথে একই ক্লাশে ভর্তি হতে হল। ফরিদা বরং এক ক্লাস ডিঙিয়ে আমার সাথেই ভর্তি হল। ফরিদা আর আমি পিঠো পিঠি। আমি সব কাজে তড়ি ঘড়ি, তড়বড়, ফরিদা ওরফে রুবী ধীরস্থির, শান্তশিষ্ট। দু'জনে মানিক জোড়ের মত বড় হয়েছি। এক সাথে, এক ক্লাসে ভর্তি হয়ে আমি মহা খুশী। আব্বাও খুশী। এক বইয়ে এক পাঠে দুই মেয়ের পড়াশুনো হবে। বাস্তবিক ফরিদার এক ক্লাস ওপরে তোলার বুদ্ধিটা আব্বাই বড়দিমনি-শান্তিদির মাথায় ঢুকিয়ে ছিলেন। বড় আপাও ভর্তি হয়েছে ক্লাস এইটে। যাই হোক, ‘জয় জয় রঘুপতি রাখব রাজা রাম’ এ ড্রিল শেডের সামনের দিকে বড়আপা রোজীবুও ছিল হয়তো বা, ঠিক মনে নেই।

মনে আছে গান শেষে ঢং ঢং করে ক্লাস শুরু ঘণ্টা বাজলে যখন গুটি গুটি অন্য মেয়েদের সাথে ক্লাসের দিকে এগুলাম তখন আমাদের জন্যে অপেক্ষা করে ছিল এক মহা বিড়ম্বনা।

ক্লাস ফাইভের তিনটি সেকশন।

ছাত্রী সংখ্যা যথেষ্ট। এক ক্লাস ঘরে অত মেয়েদের ঠাঁই হবে না বলেই তিনটি সেকশনের ব্যবস্থা। আমরা ভর্তি হয়েছি শেষের দিকে। অগত্যা ঠাঁই হয়েছে ‘সি’ সেকশনে কিন্তু ক্লাসে ঢুকতে গিয়ে দেখি ঠাঁই নেই।

আমাদের দু'জনকে পেছনে ফেলে অন্য মেয়েরা হুড়মুড় করে ক্লাসে ঢুকছে আর যাবার সময়ে বলে যাচ্ছে ‘আড়ি’। ‘আড়ি’ কথাটার অর্থ জানলেও মর্মটা সেদিনই প্রথম টের পেলাম। ‘আড়ি’ অর্থাৎ আমাদের সাথে ওরা কেউ মিশবে না, কথা বলবে না, সহযোগিতা করবে না। কেন, কী আমাদের অপরাধ সেটা অবশ্য বুঝলাম না।

সব মেয়েরা ঠেলা ঠেলি করে, কনুই গুঁতো মেরে ভেতরে ঢুকে যাবার পর আমরা তখনও তাদের ‘আড়ি’র ধাক্কায় ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে চৌকাঠের বাইরেই দাঁড়িয়ে আছি। সুলতানা বরিশালেরই মেয়ে। সে অনেক আগে থেকেই সদর গার্লস্ স্কুলের ছাত্রী। বাবা জাঁদরেল উকিল। বরিশালে তাঁর নাম ডাক প্রসার প্রতিপত্তি, খাতির যত্নে শিশু ক্লাস থেকে ধাপে ধাপে ক্লাস ফাইভে উঠেছে। ধাতস্থ হয়েছে। ভালো ছাত্রী, কনুই গুতো বা ‘আড়ি’র ধাক্কা তাকে খেতে হয়নি।

সে ‘এ’ সেকশনের ছাত্রী; আমাদের আগেই নিজের ক্লাসে চলে গেছে।
সে পাশে থাকলে হয়তো একটু সাহস পেতাম; কিন্তু তার অভাবে আমরা আরোই হতভম্ব; কিং কর্তব্য বিমূঢ়।
মাটির কাঁচা ল্যাপা পোঁছা মেঝে লম্বা বারান্দার পাশে সারি সারি টিনের শেডে ক্লাস ঘরগুলো। ভেতরে ঢুকলেই টীচারের ডেস্ক; তার সামনে সারি সারি বই রাখার উঁচু বেঞ্চের পেছনে নিচু বসার বেঞ্চগুলো। যতদূর চোখ গেল বড় চুল, খোলা লম্বা চুল অথবা দু'বেনী বাঁধা মেয়েদের মাথায় মাথায় ভর্তি। একটাও আসন খালি নজরে পড়ল না।
কোথায় বসব ভেবে আমরা দু'বোন তখনও তৃশঙ্কুর মত দাঁড়িয়ে।
দূর থেকে লম্বা, শুকনো শরীর, একহারা শাড়ি পরা দিদি মনিকে বারান্দা পথে এদিকে আসতে দেখে প্রমাদ গুনলাম। দুজনে মুখ চাওয়া চাউয়ি করে বুঝলাম এখানে ঐ ভাবে দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক নয়। দিদিমনি যত কাছে এগিয়ে আসছেন তত শুধু তার বড় বড় গোল চোখের বিরক্তি নজরে পড়ছে।
পরবর্তী করণীয় ঠিক না করলেই নয় বুঝে চৌকাঠের ভেতরে পা রাখতেই সামনের বেঞ্চীতে বসা এই ক্লাসের তুলনায় একটু বড় সড় গোছের একটি মেয়ে আমাদের কাছে এগিয়ে এলো। আর সব মেয়েদের পরনে ফ্রক থাকলেও সেই মেয়েটির পরনে ছিল কুচি পাড় একটা সাদা শাড়ি।
সে কাছে এসে বেশ একটা বন্ধুত্ব সূলভ ভঙ্গিতে তর্জনী নির্দেশে একেবারে পেছনের একটা খালি বেঞ্চ দেখিয়ে দিল। অর্থাৎ আমাদের ওখানে বসতে হবে মুখে কিছু বলল না।
বুঝলাম আড়ি দেবার মানে কথাও বন্ধ।
দিদিমনি তাঁর পটলচেরা বিরাট চোখ দু'টি রাগে গোল করে তখন আরো কাছে এসে পড়েছেন। আর দেরি না করে চটপট পেছনের বেঞ্চিতে গিয়ে আমি আর রুবী বসে পড়লাম।
তবে খুশী হলাম না তা বলাই বাহুল্য।
আমার ছোট বেলা থেকেই নজর কাড়ার সাধ, বোধ হয় নজরে পড়তাম না বলেই তখন পর্যন্ত আমাদের বোনের সংখ্যা পাঁচটি। এক আমি বাদে আর সব ক'টি বোনের সুন্দরী বলে সুনাম। বড় বোনের পর আমি মেঝো, তার পর আবারও বোন রুবী। মার পুত্রের অভাব মেটাতে তিন বছর বয়স পর্যন্ত আমার পরনে থাকতো সেলর স্যুট, ‘নটি বয়’ সুজ এবং চুলে ছেলেদের ছাঁট। আর প্রথম তিনটি বোনের মধ্যে মধ্যম আমি শুধু ছেলেদের পোশাকই নয় তাদের স্বভাবটিও অর্জন করে ফেলেছিলাম। গেছো বাঁদর, ডানপিটের শিরোমনি, কালো কুচ্ছিৎ খেতাবগুলো জুটে গেছে ইতোমধ্যেই।
সুতরাং নজর কাড়ার চেষ্টায় অহরহই থাকতাম ব্যস্ত। সেই আমাকে প্রথম দিনই ওভাবে পেছনের বেঞ্চে ঠেলে দেয়াতে আমার ভেতরে রাগ চড় চড় করে উঠল। কি করে ওদের জব্দ করা যায় তার পরিকল্পনা সুড়সুড়ি দিতে থাকলো মাথায়।
কিন্তু ক্লাস ঘরে দিদিমনি ঢোকার পর তখন পিন পড়লেও শোনা যায় স্তব্ধতা। আমি রুবীকে কিছু বলার চেষ্টা করতেই, রুবী আমাকে একটা গুঁতো মেরে থামিয় দিল।
দিদিমনির নাম পটলদি বলে পরে জেনেছিলাম। তিনি কটমট করে সারি সারি বসা মেয়েদের দিকে এক নজর তাকিয়ে খাতা খুলে নাম ডাকা শুরু করলেন।
মঞ্জু, পারুল, বীথি, শর্বানী, রাধারাণী, সুশীলা, কল্যাণী, অঞ্জলী, কৃষ্ণা, সর্বিতা, মায়া, অনুরাধা, এমনি করে গোটা চল্লিশ নামের পর দিলারা ও ফরিদা নাম দু'টি ডাকার সাথে সাথেই গোটা ক্লাসে একটা চাপা হাসির লহর বয়ে গেল। আর আমরা অন্য মেয়েগুলো তাদের নাম ডাকার সাথে সাথে যেভাবে ‘প্রেজেন্ট প্লীজ’ বলে সাড়া দিচ্ছিল তা করতেও ভুলে গেলাম।
পটলদি মেয়েগুলোর দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে ততোধিক তীক্ষ্ণ স্বরে ‘সাইলেন্স’ কথাটি উচ্চারণ করে আবারও আমাদের নাম দু'টি ডাকলেন কেননা আমরা সাড়া দিইনি।
এবারে আমি সাথে সাথে স্পিং-এর পুতুলের মত লাফিয়ে উঠে ‘প্রেজেন্ট প্লীজ’ বলার পর রুবীও মিহি স্বরে ‘প্রেজেন্ট প্লীজ’ বলে উঠল।

দিদিমনি আমাদের দিকে তাঁর সেই ড্যাবডেবে বিশাল চোখ মেলে জানতে চাইলেন – 'কে দিলারা, কে ফরিদা'? আমরা নিজেদের বুকের ওপর হাত রেখে নিজেদের পরিচয় দিলে দিদিমনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা দু'বোন বুঝি? দিলারা খানম, ফরিদা খানম?' আমরা মাথা নেড়ে সায় দিতেই আবার ফিক ফিক করে হাসি শুরু হল।

পটলদি টেবিলের ওপরে রাখা রুলারটা তুলে পটাশ করে একটা বাড়ি মেরে আবার হাঁকড়ালেন – 'সাইলেন্স'। সাথে সাথে সবাই চুপ।

বুঝলাম পটলদিমনিকে মেয়েগুলো ভক্তি করুক আর না করুক ভয় ঠিকই পায়।

পটলদিমনি এভাবে রুলারটা দিয়েই আমাদের বসে পড়ার ইঙ্গিত করতেই আমরা চুপ চাপ বসে পড়লাম। আর এতক্ষণে উপলব্ধি করলাম – নামে কি বা আসে যায় বলে একটা কথা থাকলেও আমাদের নামের জন্যেই বিড়ম্বনা হয়েছিল।

গোটা সি সেকশনে শুধু আমরা দু'জনই ছিলাম মুসলমান মেয়ে।

কোন রকমে নির্বিঘ্নে ক্লাস শেষ করে লাঞ্চের খাবারের ঘন্টা বাজতে এবং দিদিমনি চলে যাবার পরই আবার শুরু হল আমাদের দু'জনকে দেখিয়ে হাসাহাসি ও হেনস্থা।

এবারে জুতা সমাচার।

ছোট বেলায় মা আমাকে ছেলেদের পোশাক পরাতেন ও চুলে দিতেন ছেলেদের ছাঁট - তা আগেই বলেছি। তবে সেটা আমার বছর তিন বয়স হওয়া পর্যন্তই। ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত পৌঁছুতে রুবীর পর আমাদের দু'টি ভাই-এর জন্ম হয়েছে। যথাক্রমে বড়ন ও ছোটন নামে একের পর এক সেই দুই ভাইয়ের জন্মের পর মা আমার লিঙ্গ নাশের চেষ্টায় ক্ষান্ত দিয়ে দুই ছেলেকে সামলাতে অতি ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন।

তবে আমাদের প্রতি মনযোগে কোনই ঘাটতি পড়েনি তা বলে। বড় আপার চুল লম্বা করে দু বেনী গাঁথার সাথেই আমার আর রুবীর কেশ কর্ত্তনে মা ছিলেন বিশেষ যত্নবতী। রুবীর চুল ছিল অত্যান্ত ঘন ও সোজা সাটপাট। সে তুলনায় আমার চুল ততটা ঘন নয় ও তলার দিকে কোঁকড়া। নেড়া করলে চুল ঘন হয় প্রচলিত এই ধারণার বশবর্ত্তী হয়ে বেশ কয়েকবার মাথা নেড়া করার পর ততদিনে আমার চুল ঘাড় ছোঁয়া হয়েছে বটে কিন্ত তলাটা পেঁচানো স্প্রিং-এর মত। মা বেনী করতে বসে বিরক্ত হতেন। টেনে সমান করে বেনী করতে নিয়ে বারে বার তা গুটিয়ে রিংলেট হয়ে যেত। এর বিপরীতে রুবীর চুল অত ঘন ও শক্ত হওয়াতে বেনী চেপে সাথে সাথে রিবন দিয়ে না আটকালে তা ঠাস্ করে খুলে যেত।

মা তামাশা করেই আমাদের দু'বোনের চুল সম্পর্কে দুটি নির্মম মন্তব্য করতেন যা রুবী ভুলেছে কিনা জানিনা আমি এখনও ভুলিনি।

আমাকে বলতেন, 'চুল না যেন কুকুরের লেজ--টেনেও সমান করা যায় না।' আর রুবীকে বলতেন, 'চুল না যেন ঘোড়ার বালাচ' অর্থাৎ ঘোড়ার লেজের মত শক্ত ও সোজা। যাক, দুই পশুর লেজের সাথে আমাদের কেশের তুলনা ছেড়ে এবার জুতো সমাচারে আসি।

ছেলেদের পোশাক পরা খুঁচলেও নটি বয়েজ স্যু তখনও পরতে হয়। মার ধারনা জন্মেছিল জুতোটি খুব টেকসই এবং আমার মত গেছো মেয়ের জন্যে উপযুক্ত।

সেদিনও যথারীতি আমার পায়ে সেই নটি বয়েজ স্যু। অন্য মেয়েগুলো আমাদের নাম নিয়ে হাসাহাসি বন্ধ করে আমার জুতো দেখিয়ে পরস্পরের সাথে কানাকানি শুরু করল দুপুরে লাঞ্চ-এর ঘন্টা বাজতেই।

'দেখ দেখ, পাম্প স্যু পরেছে।'

' ও তো ছেলেরা পরে।'

'মুসলমান মেয়েরাও বোধ হয় পাম্প স্যু পরেছে।'

অর্থাৎ আমরা নামেই শুধু ভিন্ন নই আমাদের পোশাক পরিচ্ছদও ভিন্ন।

আড়ি দিয়ে সকাল থেকে কেউ কথা না বললেও আড়ির শর্ত ভুলে গিয়ে ছোট গড়নের রোগা পটকা একটি মেয়ে এগিয়ে এসে আমার পায়ের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে বলে উঠল – 'এই মেয়ে অমন ভন্দা জুতা

পরছো ক্যানো?' 'ভন্দা' কথাটার মানে তখনও জানিনা। আমি আর থাকতে না পেরে তাকে একটা ঠেলা দিয়ে বলে উঠলাম 'রোগা পুটকি মেয়ে, আমি কী জুতো পরি তাতে তোমার কি?'

রাগের চোটে 'রোগা পটকা' কথাটা 'রোগা পুটকী' হয়ে আমার মুখ দিয়ে বেরুলো। হয়তো বা 'পটকা'র স্ত্রী লিঙ্গ 'পুটকী' হওয়া উচিৎ বলে আমার মনে হয়ে থাকতে পারে কিন্তু আমার সেই কথার পর যেন একটা বোমা ফাটল।

রাগত ঠেঁচামেচি শুরু হয়ে গেল। ক্লাসের শুরুতে কালো পাড় সাদা শাড়ি পরনে বড় গোছের যে মেয়েটি আমাদের পেছনের বেঞ্চিতে বসার নির্দেশ দিয়েছিল সে সামনে এসে কোমরে হাত দিয়ে কটমট করে আমার দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, 'দাঁড়াও দেখাচ্ছি মজা! অসভ্য মেয়ে; কথা বলতে জানো না?'

আমরা দু'জনেই তখন ফ্যাকাশে হয়ে গেছি কী অসভ্যতা করেছি, এবং কী মজা দেখতে হবে সেই চিন্তায়। দিনটি শেষ হবার আগেই মজার নমুনা ও অসভ্যতার গুরুত্ব টের পেলাম।

জটিল মানুষ ও দীর্ণ প্রতিবেশ

ডঃ আলী রীয়াজ

রবীন্দ্রনাথ, যিনি কবিতা, গান, ছোটগল্প, নাটক ইত্যাকার বিচিত্র বিষয়ে গড়ে তুলেছিলেন এক একটি বিশাল বিশ্ব--তিনি কেন এতো কম সংখ্যক উপন্যাস লিখলেন ভাবলেই আমাদেরকে বিস্ময় এবং দুঃখ গ্রাস করে ফেলে। যার অজস্র কবিতা, অপরিমেয় গান, বিরাটায়তন ছোট গল্প-গুচ্ছ, উজ্জ্বল পরিমাণ নাটক আমাদের বিস্ময়ের আধার হয়ে আছে, তিনি উপন্যাস মাত্র লিখলেন এক কুড়িরও কম--ভাবতেও কেমন যেন অসম্ভব

ঠেকে। কিন্তু কী করে যেনো তাই রূঢ় বাস্তবে পরিণত হয়েছে। তারই সাথে সাথে ঘটেছে আরেকটি বিষয়ঃ সংখ্যায় কম হয়েও উপন্যাসগুলো একটি বিশাল, গভীর সমুদ্রের মতো প্রাণোচ্ছল স্রোতধারার অধিকারী হয়ে আছে। আপন বৈশিষ্ট্যে তা হয়ে আছে উজ্জ্বল এবং অন্যার্থে এক আলাদা রবীন্দ্রনাথের জন্ম হয়েছে সেখানে--যিনি আমাদের চেনা পরিচিত রবীন্দ্রনাথ নন, একজন আলাদা রবীন্দ্রনাথঃ পূর্ণাঙ্গ ঔপন্যাসিক। সংখ্যায় অল্প কিন্তু কম নয়। কোন কিছুরই কমতি নেই, কোনোভাবেই নেই তাতে অপূর্ণতা, নেই তাতে অভাব এবং ফলতঃ আমাদের অভিযোগও অনুপস্থিত। হয়তো খেদ থাকে যদি সংখ্যায় তা প্রচুর হতো তবে আমরা বর্তমানে নিশ্চল এই সাহিত্য শাখাটিকে স্থাপন করতে পারতাম আরো অনেক অগ্রসর স্থানে। যেমন তিনি বাংলা কবিতাকে স্থা পন করে দিয়েছেন বৈশ্বিক সাহিত্যের বর্ণিল দরবারে, তেমনি আমাদের উপন্যাসও হাজার-দুয়ারী বৈশ্বিক সাহিত্য মঞ্জিলের একটি বিশিষ্ট দ্বার হয়ে উঠতে পারতো।

কি আছে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে? এ প্রশ্নের সরল উত্তর নেই– থাকতে পারে না। তবে রবীন্দ্র উপন্যাসের দু'টি মৌল চরিত্রের প্রসঙ্গ এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে; তা হলো মানব মনের গহনে তার রক্তাক্ত পদাচরণা এবং প্রতিবেশ পৃথিবীর অসামান্য উজ্জ্বল চিত্র। খণ্ডিতভাবে নয়, বরং একটি অদৃশ্য সূত্রে তিনি সমন্বিত করেছেনঃ ব্যক্তি--তাঁর নিভৃত মনের গোপন চেহারা এবং বাইরের উন্মাতাল বিশ্বের দ্বন্দ্বময় প্রতিবেশ। বিদ্রোহী উপন্যাসগুচ্ছের জনক এই মহান ঔপন্যাসিক একই সাথে ভেতর-মহল ও বাহির-ভুবন প্রদক্ষিণ করে যে রক্তাক্ত, দ্বন্দ্বময়, ছিন্নভিন্ন রূপ প্রত্যক্ষ করেছেন তাকে তিনি এক করে তুলেছেন তাঁর উপন্যাসে– শিল্প ও জীবনের দাবী সমভাবে পূরণ করার কষ্টকর কাজ অবলীলায় সম্পন্ন করেছেন।

'বৌঠাকুরাণীর হাট' ও 'রাজর্ষী'-র দ্বিধান্বিত পদক্ষেপকে বাদ দিলে প্রথম শিল্পিত সাহসের চিহ্ন বুকে নিয়ে বেরিয়েছিলো 'চোখের বালি'। তার ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন – 'গল্পের আবদার যখন এড়াতে পারলাম না তখন নামতে হল মনের সংসারের সেই কারখানা-ঘরে যেখানে আগুনের জ্বলুনি, হাতুড়ির পিটুনি থেকে দৃঢ় ধাতুর মূর্তি জেগে উঠতে থাকে'। যথার্থ অর্থেই রবীন্দ্রনাথ নেমেছিলেন মানব মনের সেই গহন-গৃহে আর তারই ফল ঘটলো

এইভাবে – 'যেন পশুশালার দরোজা খুলে দেওয়া হল, বেরিয়ে পড়ল হিংস্র ঘটনাগুলো অসংযত হয়ে'। মানব মনের সেই জটিল, রক্তময়, হিংস্র, ছিন্নভিন্ন চেহারারই প্রতিভাস ফুটে উঠছিলো রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে – 'চোখের বালি' থেকে তার যাত্রা সবে শুরু। 'চোখের বালি'র বিনোদিনীর কথা সর্বাগ্রে স্মরণ হয়ে যায়, স্মরণ হয়ে যায় তাঁর আর্ত কণ্ঠস্বরও – 'ইহকালে আমার সমস্ত দাবি আমি মুছিয়া ফেলিব, এতো ভাল আমি নই – ধর্মশাস্ত্রের পুঁথি আমি এত করিয়া পড়ি নাই। আমি যাহা ছাড়িব তাহার বদলে আমি কী পাইব'? তাঁর যন্ত্রণা, বেদনা, ভালোবাসার পাশে যে কামনা-বাসনার শিখা জ্বলছে তাকে রবীন্দ্রনাথ অস্বীকার করেননি। আর অস্বীকার করেননি বলেই বিনোদিনী এতো ক্ষীপ্র হয়ে এসে ধরা দিয়েছে তাঁর কলমে। শুধু কি বিনোদিনী একা? 'চোখের বালি'র অন্যান্য চরিত্র – মহেন্দ্র কিংবা রাজলক্ষ্মী কোনো অংশেই কী অবজ্ঞা বা অবহেলার শিকার হয়েছে? 'নৌকা ডুবি'র রমেশ, হেমনলিনী, কমলা, নলিনাক্ষ ও অক্ষয়ের মনোগহনে যে জ্বালা, যে প্রত্যাশা ও বাস্তবের সাথে যে অহর্নিশ লড়াইয়ে তাঁরা প্রতি মুহূর্তে রক্তাক্ত হয়ে উঠেছেন তার চেহারা দেখে আমরা শিউরে উঠতে বাধ্য হই। এক নির্দয় লেখকের সন্ধান পাই তখন রবীন্দ্রনাথের ভেতর, মানব-মনের কারখানা ঘরের আগুনের তাপ আমাদের গা পুড়িয়ে দেয়, জেগে উঠতে থাকে ধাতুর মুর্তি। তারই প্রতিরূপ 'গোরা' উপন্যাসের গোরা চরিত্রে দেখতে পাই, বিশেষতঃ যখন 'শৈশব হইতেই এত বৎসর তাহার জীবনের যে ভিত্তি গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা একেবারেই বিলীন হইয়া গেল। ...তাহার মা নাই, বাপ নাই, দেশ নাই, জাতি নাই, নাথ নাই, গোত্র নাই, দেবতা নাই'। একজন ব্যক্তির এই তীব্র অসহায়ত্বের বেদনা এবং তার তীব্র অনুভূতিকেই মূর্ত করে তুলেছেন গোরা চরিত্রে। সেখানে নিয়ত যে একাকী মানুষ তারই কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়েছে, তারই অন্তর্লোকের রূপ প্রতিবিম্বিত হয়েছে। 'চতুরঙ্গ'-এ এসে রবীন্দ্রনাথ যেনো আরো ভেতর মহলে প্রবিষ্ট হলেন, আরো গভীরে; আরো ব্যাপ্ত করলেন তিনি তার শিকড়। দ্বন্দ্বে, সংশয়ে, কামনায়, বাসনায়, যন্ত্রণায় বিদ্ধ হয়ে মানুষের ভেতরে ভেতরে যে অবিরাম রক্তক্ষরণ হতে থাকে তা শচীশ ও দামিনীকে দেখলে বুঝতে কষ্ট হয় না। আর তাই শচীশের দিনলিপিতে দামিনীর উদগ্র বাসনার ছবিঃ 'তারপর কিসে আমার পা জড়াইয়া ধরিল। প্রথমে ভাবিলাম কোনো একটি বুনো জন্তু। কিন্তু তাহাদের গায়েতো রোঁওয়া আছে, এর রোঁওয়া নাই। আমার সমস্ত শরীর যেন কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। মনে হইল একি সাপের মতো জন্তু, তাহাকে চিনি না। তার কি রকম মুণ্ডু, কি রকম গা, কি রকম লেজ কিছুই জানা নাই--তার গ্রাস করিবার প্রণালীটা কি, ভাবিয়া পাইলাম না। সে এমন নরম বলিয়াই এমন বীভৎস সেই ক্ষুধার পুঞ্জ'। দামিনীর এই বাসনার অবসান যে এখানেই নয় তার প্রমাণও মেলে যখন মৃত্যুর আগে সে শ্রীবিলাসকে বলেঃ 'সাধ মিটিল না, জন্মান্তরে আবার যেন তোমাকে পাই'। দামিনীর আনুষ্ঠানিক জীবন-ইতিহাস যে দ্বন্দ্ব ও লড়াইয়ের ইতিহাস তা আমাদের ভেতরে তাকে বসিয়ে দেয় অন্য এক উজ্জ্বল আসনে। বঞ্চিতার ভাগ্য সে মেনে নেয়নি, লড়াই করেছে, তার অনুভবে সে জিতেছেও। 'ঘরে-বাইরে'র বিমলাও এই প্রবল রক্তক্ষরণ থেকে দূরে থাকতে পারেনি। আর তাই নিখিলেশ ও সন্দীপ দুই আলাদা আসন গেড়ে বসে তাঁর মনে, টানাপোড়নের দোলা চলে দোদুল্যমান হয়ে, তাঁর মন হয়ে যায় দ্বিখণ্ডিত। তারই ফোটা ফোটা রক্ত রবীন্দ্রনাথের কলমের কালি হয়ে লিখে দেয় 'ঘরে-বাইরে'র মতো উপন্যাস। 'যোগাযোগ' উপন্যাসে একদিকে কুমু মধুসূদনের দাম্ভিকতা ও লোলুপ কামনার আগুনে পুড়ছে অন্যদিকে বিপ্রদাস পুড়েছে তাঁর আদর্শের সাথে বাস্তবের সংঘাতের চেহারা দেখে, তাঁর বিশ্বাস ভাঙতে দেখে সে মুহ্যমান হয়ে পড়ছে শোকে, দুঃখে, বেদনায়। আবার জেগেও উঠছে সে ক্ষোভে, ক্রোধে। এতো বিচিত্র অনুভূতির সংমিশ্রণের জন্যে ক্রমাগতভাবে মনের ভেতরে চলছে হাতুড়ি পেটুনি– তার শব্দ মনের ভেতরে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে অহর্নিশ আর আমাদের ভেতরে তার সঞ্চারণ এনে দিচ্ছে এক অপরিমেয় অনিঃশেষ জ্বালা-যন্ত্রণা। এই দ্বন্দ্বময়তা ও দোদুল্যমানতা সবচেয়ে সহজ, সরলভাবে ধরা দেয় 'শেষের কবিতা'র লাবন্য–অমিতের প্রেম-কাহিনীতে, ধরা দেয় 'দুই বোন'-এর শশাঙ্ক কিংবা 'মালঞ্চ'-এর আদিত্য চরিত্রের স্পষ্ট উদ্ভাসনে। ভালোবাসার চোরাকুঠুরিতে এতো ভাগ, এতো ক্ষুদ্র সম-পরিমাণ বিভক্তি একজন ব্যক্তিকে কতটুকু অশান্তিতে, অস্বস্তিতে, অস্থিরতায়, অসহায়তায় ঠেলে দেয়, দিতে পারে তা কি এর চেয়েও স্পষ্টভাবে পরিস্ফুট হতে পারতো অন্য কারো হাতে? অমিতের মনের ভেতরে অন্তরের সঙ্গী আকাশ ব্যাপ্ত ভালোবাসা এবং সংসারের আনন্দ প্রতিদিনের প্রেমের প্রত্যাশা যে অগ্নিময় সংরক্ততার জন্ম দেয় তা কি করে রবীন্দ্রনাথ এতো কোমলভাবে, নির্লিপ্ত, নির্মোহ, নৈর্ব্যক্তিকভাবে লিপিবদ্ধ করলেন তা ভাবতে আমাদের বিস্ময়ও হার মানে। একদিকে ক্ষতবিক্ষত দেশ, সমাজ, প্রতিবেশ, অন্যদিকে

রক্তাক্ত হৃদয়-গাঁথা পাশাপাশি আপন গতিতে চলেছে। অতীনের কাছে ইলার কাম বিনেদনের হৃদয়প্লাবী ছবির পাশেই দাঁড়িয়ে আছে ইন্দ্রনাথের সেই কঠিন কঠোর প্রায়-অমানবিক চেহারা, কর্মকাণ্ড। প্রতিবেশ, পৃথিবী ও মানব মনোগহনের সমন্বিতকরণের রাবিন্দ্রীক প্রয়াসের তুঙ্গাতম প্রকাশ 'চার অধ্যায়'-এ ঘটলেও যাত্রা তাঁর শুরু হয়েছিলো 'চোখের বালি'-তেই।

'চোখের বালি' উপন্যাসে মানব মনের ভেতরের যে অগ্নিকাণ্ড, তার অন্তরের যে ক্ষত থেকে ক্রমাগত রক্তক্ষরণ ঘটছে তার জন্মের জন্যে বাইরের প্রান্তর কি কোন অংশে কম দায়ী? 'চোখের বালি'র আশা, বিনোদিনী, রাজলক্ষী, বিহারী, মহেন্দ্রের দ্বন্দ্বময়তার উৎস যে সমাজ ও প্রতিবেশ তা বুঝতে আমাদের কষ্ট হয় না যখন দেখি বিনোদিনীর গৃহিণী হবার সমস্ত গুণাবলী সমাজের প্রতিক্রিয়াশীলতা ও সংস্কারের জন্যে ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। বিনোদিনীর উত্তপ্ত ভারী নিঃশ্বাসের সাথে যে অভিশাপ বেরিয়ে আসছে তার লক্ষ্য গৃহিণী আশা নয়, অসুস্থা রাজলক্ষ্মী নয়, মেরুদন্ডহীন মহেন্দ্র নয়--এমন কি অন্য কোনো ব্যক্তি নয়--সমাজ, তার সংস্কারন্ধতা। তারই সম্প্রসারণ ঘটেছে 'নৌকাডুবি'তে। রমেশ, হেমনলিনী, কমলা, নলিনাক্ষ, অক্ষয়ের মতো রক্তমাংসময় মানুষেরাও যে সমাজ সংস্কারের কাছে কত অসহায় হয়ে যান তারই ছবি এই উপন্যাসে বিধৃত। 'গোরা'য় রবীন্দ্রনাথ একটি বিরাটায়তন সমাজের ছবিকে তুলে ধরেছেন। একদিকে ধর্মীয় শাসন-শোষণ অন্যদিকে তার বিপক্ষীয় কার্যকলাপের অন্তঃসারশূন্যতা; বিদেশী শোষণের তীব্র চেহারার পাশে স্বাদেশীকতার নামে আত্মস্বার্থ উদ্ধারের ঘৃণ্য প্রয়াস। সমাজ সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার গায়ে গায়ে লেগে আছে সমাজ সংস্কার আন্দোলনের অর্বাচীনতা। 'গোরা' এমনি এক সময়ের ছবি তুলে এনেছে যে সময়টি হচ্ছে এই উপমহাদেশের সমস্ত আর্থ-রাজনৈতিক-সামাজিক ঘটনার উৎস: তা হলো ঊনবিংশ শতাব্দীর সেই আন্দোলন মুখর বাংলাদেশের ছবি। এমনি এলোমেলো সময়ে দাঁড়িয়ে গোরা-সুচরিতা ও বিনয়-ললিতার প্রেম যে নিস্কণ্টকভাবে এগুতে পারে না তা বলাই বাহুল্য। আর গোরাকে তো এই সময়েরই ফসল বলা যায়।

'চতুরঙ্গ'কে আপাতঃ দৃষ্টিতে ঘরোয়া মেজাজের পারিবারিক ঘটনার সঙ্কীর্ণ প্রেম কাহিনী মনে হলেও সে ধারণা আর বেশিক্ষণ টেকে না। কেননা উদভ্রান্ত বাসনায় আক্রান্ত দামিনীর কণ্ঠেই আমরা শুনেছি সেই তীব্র তীক্ষ্ণ, শাণিত প্রশ্নঃ 'নির্লজ্জ নিষ্ঠুর সর্বশেষ রসের রসাতল হইতে মানুষকে রক্ষা করিবার কী উপায় তোমরা করিয়াছ'। এই উপন্যাসে সংস্কারাচ্ছন্ন মানুষের কদর্য চেহারাই শুধু প্রকটিত হয়নি, উচ্চারিত হয়েছে মানবিতকার জয়যাত্রা, মানব ধর্মের বিজয়। 'ঘরে বাইরে'র নিখিলেশ-বিমলার করুণ পরিণতির জন্যে আন্দোলনমুখর দেশের অবদানই তো বেশি। দেশের আকুল আহ্বানই তো নিখিলেশকে তার খোলস ভেঙে টেনে বার করে এনেছে; সন্দ্বীপের ভণ্ড চেহারা উদ্ভাসিত হলো তার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড দিয়েই। 'যোগাযোগ'-এ বিপ্রদাশ কুমুর জীবনের ব্যর্থতার আগুনের আঁচেই অনুভব করতে পারলেন – 'মেয়েদের যে অপমান, সে আছে সমস্ত সমাজের ভিতরে, সে কোনো একজন মেয়ের নয়'। আর কুমু এই আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে উঠলো – 'জঞ্জাল একেবারে ঢেকে ফেলেনি জগৎটাকে'।

তারপর বলতে গেলে বলতে হয় 'চার-অধ্যায়' এর কথা। সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের রক্তে অতীনের চোখ অন্ধ হয়ে গিয়েছিলো নতুবা কেনো সে 'এলা'-র ভালোবাসাকে এতো সহজে অবহেলা করবে। রবীন্দ্রনাথ যতই বলুন না কেনো এলা-অতীনের প্রেম এ বইয়ের মূল কাহিনী, আমরা কোনোভাবেই কিন্তু তার পারিপার্শ্বিক ঘটনাস্রোত থেকে এই প্রেমকে বিচ্ছিন্ন করতে পারি না। কেননা অতীনের যে বুকের মধ্যে পঙ্কিলতা, নীচতা, মিথ্যাচারণ, অবিশ্বাস, চক্রান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ গুমরে মরেছে সেখানেই এলা স্থান করেছিলো। সেই ঝড়–ঝঞ্ঝায়, ক্রুদ্ধ বিক্ষত হৃদয়ে এলা শান্তি ও স্থিতি আনতে চেয়েছিলো। তাকে অস্বীকার করার কী আদৌ কোনো জো আছে?

আমাদের মনে হয় নেই, আর নেই বলেই তাঁর পক্ষে জটিল কুটিল মানব-মনের পাশে অবলীলায় প্রতিবেশ-পরিবেশের দীর্ণ ছবিটি সেঁটে দেওয়া সম্ভব হয়েছে; জন্ম হয়েছে এক মহান ঔপন্যাসিকেরঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর॥

ফকির ইলিয়াস

পাশে রেখে আংশিক আঁধার

পাশে রেখে আংশিক আঁধার, চাঁদ এবং উদ্যান দাঁড়িয়েছিল মুখোমুখি
নেমে আসার আগে জমাট মেঘ যেমন জানে প্রবাহের গভীরতা
কথা ও কল্প, স্তুতি ও স্থিতি, ভেসে যাওয়ার আগে কুমারী নদীর
মন খুঁজে সুষম রঙের বাহার – আর মূর্ছনার সন্ধ্যা, অতীত কৃতিত্ব ।

সঞ্চয়ে যখন সমুদ্র ছাড়া কিছুই অবশিষ্ট থাকে না
ঘুম নেমে এসে দেখায় তার বিপুল গর্জন, অর্জন এবং
অস্তিত্ব ভাসে – কেবলই ভাসতে থাকে, দাঁড়াবে কোথায়
বলো কার হাত
ধরে ধরে ধীরে
স্বপ্নের সতীর্থ হয়ে দ্বৈত হেমন্ত যেনো ফিরে যায় ঘরে ।

বহুগামী সূর্যরেখা

সাতটি সমুদ্রকে সাক্ষী রেখে ক্রমশ: হারিয়ে গেল বহুগামী
সূর্যরেখা । আবার ফিরবো আমি । কানে কানে বলে গেলো
সে কথাটিও । তার কথা কেউ শুনলো । কেউ শুনলো না ।
সূর্যেরা প্রতিদিন ফিরে,
মানুষেরা ফিরে না, শত
অঙ্গীকারও উড়ে যায় অক্ষর হয়ে

মোমবাতি-রাত, জোনাকি-জোছনা
ধ্রুপদী ওম্ হয়ে থাকে... হায়
মানুষের আয়ু যদি কোনোদিন সূর্যের দ্বিগুণ হয়!

†LqvK_v

K. কাছে ঘেঁষার কৃতিত্বটুকু একক তোমারই থাক
যাক, নদী বয়ে প্রথম উজানে
এইসব খেয়াকথা তার চেয়ে ভালো
বলো আর কে জানে!

L. বীজগুলো অংকুরিত হচ্ছে
অতএব বাড়ছে খামার....
বুননের সম্মত ভ্রমনে
প্রেম-ই তো প্রাণ-শূন্যতার ।

M. কেঁপে ওঠো রোদ, ছায়া হও বৃষ্টি
দৃষ্টির স্বদেশ
তোমাকেই খুঁজছে সন্তান
সৌরগ্রহে আলোর প্রবেশ!

N. নিয়মই নিয়তি নয়, জ্যামিতির নিরঙ্কুশ রেখা
তবুয়ো বিলাসী মন শস্যস্মৃতি খুঁজে
খেয়ানৌকো বায় .....
টানে দাঁড়, যদি হয় রাধার সাথে অলৌকিক দেখা!

অনার্য শরত

একদিন নিজের ছায়াটুকুই খুঁজে পাবে বৃদ্ধ বারান্দা । কারা কবে ছুঁয়েছিল তাকে, কারা জ্বালিয়েছিল সর্বশেষ মোমবাতি – এমন ক্ষণতর্পন করে সাজাবে বেদনার পসরাসমূহ! যে লোকটি এই ছায়াঘরে প্রতিদিন হাঁটতেন, প্রতিরাতে খুঁজতেন আকাশের তারা সংখ্যা – তাঁর প্রশ্বাস খুঁজে বারান্দাই হয়ে যাবে ফালগুনের সোনালী উদ্যান ।

মানুষ পথ ভালোবাসে । ভালোবাসে পুষ্পের বিশালতা । যাওয়ার প্রতিজ্ঞা নিয়ে যে জীবন আবার জম্মায় – যায় তো সেও শূন্য সমুদ্রে । আসলে সমুদ্রই অমরতার প্রতীক । হে দৃষ্টি! জন্মের ধ্রুবপথ! একদিন প্রতিটি নি:শ্বাস হবে জানি, অনার্য শরত ।

নীলের নিখিল

খোঁজার আনন্দকে সাথী করে হেঁটেছি বহুপথ। রথযাত্রার মেঘে দ্বৈত ভেসে কাছে এসেছে আমাদের ভাষাদিন, বর্ণরাত। হঠাৎ সীমারেখা হয়ে থামিয়ে দিয়েছে সন্ধ্যার বরাদ্দ – রাত জেগে উঠার সামান্য আগে, রঙ জাগে আকাশের আঙিনায়। মন খোঁজে নীলের নিখিল।

হারানোর তাগিদ ছিল তাই, ভ্রমন সংক্ষিপ্ত করে ছুটে যেতে চেয়েছিলাম গতিময় ফোয়ারার কাছে। ধাবমান অক্ষরের কাছে। দরদী নদীদের কাছে।

কথা ছিল, নদীরা ধারণ করবে স্মৃতির চিত্রাবলী। অক্ষরগুলো
উড়ে উড়ে হবে শ্বেতকপোত। চিরন্তন আমি হবো কালের ফোয়ারা। আর তুমি,
সকল উচ্ছাস ধারণ করে আবার আঁকবে
প্রজন্মের ছাপান্নো হাজার সবুজ বর্গমাইল।

ফারহানা ইলিয়াস তুলি

উত্থান সব গিয়েছে উজানে

বিরোধ শেষ করে উত্থানগুলো
সব গিয়েছে উজানে, নদীর সাথে আর
তাদের কোনো বৈরিতা নেই। সকালের
সাথে হয়েছে আবার নিবিড় সংযোগ।

আমাদের উত্থান নেই,
জীবন্ত মমির মতো আমরা
দাঁড়িয়ে আছি জলবায়ু হীন
মানুষ কি না তাই!
নদী হলে অন্তত: উজাতে পারতাম।

ফ্যাশনে সূর্যাস্তের দৃশ্য

হালকা জামদানী পরে জেগে আছে প্যারিস শহর
কেউ আসবে বলে এমন অপেক্ষা কিনা তা বোঝা
যায় না। তবে ঘন কুয়াশা মোড়া চাঁদের শরীর
নারী হয়ে নগরে নেমেছে তা বোঝা যায়। ফরাসী
সৌরভে কৌলিন্য পায় আদিম তামার তাঁত।

ফ্যাশন শো দেখে মধ্যরাতে আমরা মোটেলে ফিরি
ফ্যাশনে সবুজ সূর্যাস্তের দৃশ্যগুলো ছিল পাখির
ডানার মতো উড্ডীন। পাখিরাও ঘর চিনে। সূর্যও
চিনে ফ্যাশন পরিধান। সূর্য ও মানুষে তাই
বেড়ে চলে মনের আদান।

ফেরদৌস নাহার

অন্নবতী নবান্ন নীলিমা

আমি ভিক্ষার তোড়ে ভেসে যাই দ্রাঘিমার ওপারে
ঘরের আকাশ হলো বৈশাখের অগ্নিদগ্ধ মাঠ
তোলপাড় মেতে ওঠা ঝড়ের জীবন....
ওই মায়াবী মানুষগুলো কোথায় ছিল
কোথায় বা আছে তাদের আদিবাসী দিন?
আলো ক্রয়-আলো বিক্রয়, কত দিন-রাত্রির সংঘ,
গুঁড়ো গুঁড়ো ইতিহাস বাতাসে ছড়ালো তার
ফেলে আসা গান,
ভিক্ষুক জীবন আমার পরজীবী জীবিকার নামে
এক একটি সময় যায় কৌতুক অন্বেষণে
কোথায় আছো দাতা–মোক্ষম সর্বগ্রাসী ক্ষুধা
কোথায় আছো হে মাতা অন্নবতী নবান্ন নীলিমা?

প্রাচ্য তোমাকে গুডবাই....

ঘনিষ্ঠ আঁধারে আজ কেঁদে যাবে আলোর পাখি
ঘরে ফেরা হবে না ব'লে দিগন্তের পাগল বাতাস
খোঁচা দেবে সারারাত্রি ।
তুমি কেমন আছো শব্দভূক প্রাচ্য নাগরিক?
চোখের কোণে জল-বিন্দু, তুমি কেমন আছো হে
ঝোলে ভাতে মেখে খাওয়া অপূর্ণ বাঙালি?

এই সপ্তক বারান্দায় আজ থেমে আছে নক্ষত্র রাত
দূর ওই নিয়নের জ্বল-জ্বলে জ্বলে থাকা নিঃসঙ্গতা
সাক্ষী করে অন্ধ আকাশ,
শব্দ তুলে ছুটে চলে ব্লু নাইট বাস
ঝিমাতে ঝিমাতে রোজ বাড়ি ফেরে–কলের পুতুল ।

মধ্যরাত টলটলে পায়ে হাঁটে ডাউন টাউন-গৃহহীন, মাতাল
শহর ঘুমাতে গেলে নগরকে জাগিয়ে রাখে যারা
তারা টেনে কোরাস গায় – প্রাচ্য তোমাকে গুডবাই....

নাবিক

যখন ঘুমের ঘোরে জেগে থাকে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় তখন কী ভুলে যাবে আমার আলো?
তোমার জন্য আমি যে বসে ছিলাম সাতঘাটের পাশে–তুমি বোঝোনি,
কবে কখন দেবদারু বৃক্ষে কমলা রঙের পাখি কোমর দুলিয়ে ছিল
সে কথায় কী আসে যায়! তুমি তখন নাবিক হবে বলে কী যে তড়পাচ্ছিলে
ঘুম নেই–নাওয়া নেই, কী যে অস্থিরতা--চেনা যায় না...যেন ঘর ছিল না,
যেন কেউ ছিল না । এই জীবনে সেই সব কষ্ট কে ভুলতে পারে!

একটাই গল্প ছিল - তাড়িয়ে দেয়া, তোমার ঘুম ভাঙেনি – ভাঙবেও না জানি
আমার বাচ্চারা যখন মাঠে খেলতে যাবে, তুমি তখন দূর থেকে দেখবে
ছলনার তস্য ঘরে এটা সেটা করে যা হবার তা হলো না জীবনে
জানবে না কতটা ভালবাসা ধরে ছিল একঝাঁক ভূগোলভাঙা পাখি....
তোমার অসুখ সুধরাবে না, ভুলতে ভুলতে মনে পড়বে খয়েরি চোখের মণি
অনেক জলের মাঝে নিঃশ্বাসের কষ্ট তুমি, একাগ্র অন্ধকার–জলাবদ্ধ ভূমি ।

মোমার্তের বাতাস কাঁপছে

আজ বিষ্যুদবার রাত ।
তুমুল আড্ডা বসেছে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্যারিসে
কাফের গরম পানীয় আর টুকরো টুকরো ছড়িয়ে পড়া
আড্ডার শব্দ ভেদ করে জ্বলজ্বল করছে কিছু
অজানা অচেনা নতুন শব্দ--
নিচ্ছিদ্র গুঞ্জনের দেশে কে নেই?
কবি, শিল্পী, আলোকচিত্রী, ভবঘুরে কে নেই সেখানে!
মোমার্তের বাতাস কাঁপছে ইমপ্রেসনিস্ট ধ্বনিতে ।

ঘোড়ার ছুটন্ত হাঁটুর নীচে দুমড়ানো রাত
সূর্যকে আগলে ধ'রে উঁকি দিচ্ছে পাগলপ্রভাত
শ্বাসকষ্ট বয়ে বয়ে সারা হয় ক্ষুধার্ত জীবন তবু
মুক্তিপণের অঙ্কে হিসাব কষা হয় না কখনো ....
একবার যারা দেখেছে সোনালি গমের গাঢ় মাঠ
উন্মুখ আকাঙ্ক্ষায় ভরা উজ্বল সিন নদীর বয়ে চলা
তাদের রঙয়ের ঠোঁট অবিরাম চুমু খায় ক্যানভাসের শরীরে

তারা কফিখানার উষ্ণ কোমরে ঢেলে দিচ্ছে রাতজাগা হল্লা
লিনসিড গন্ধ মাখা আঙুলে তুড়ি বাজিয়ে হাঁক দেয়,
- আরেক পেয়ালা ...

ফেরদৌস জেসমীন

ভাষা হয় ভালবাসার গল্প

তুমি একা, তাই এলাম,
চোখের জলে সাঁতার কেটে আলোর ঠিকানায়
সবুজ ঘাসের মতো নারীর প্রেম ঢেলে স্বর্গ পেলাম,
তোমার আমার হারানো অক্ষরগুলি হঠাৎ প্রাণ পেয়ে
পৃথিবীতে জেগে উঠে ভাষা হয় ভালবাসার গল্প
রাঙা আভায় ঠোঁটের আলাপনে সুখের বাণী পদ্মদুলে ।

হেমন্তের কুয়াশা ঠেলে আজ চলে যাব অন্য তারায়
অসীম সুন্দরের দিকে সী-গাল পাখীদের মিছিলে,
পিছে ফিরে দেখি হৃদয় চঞ্চলে ব্যাকুল দু'টি চোখ
হাঁমাগুড়ি দিয়ে প্রিয়ার আঁচল ছুঁতে ব্যস্ত
ভাষা হয়ে ভালবাসার গল্পে কুশিয়ারা নদীর তীরে,
লীনের নীল আকাশে এক শ্রমিক বন্ধুর নীড়ে ।

শরীরের ঘাম সুগন্ধ হয়ে ভেসে এলো
সৎ, অসহ্য পরিশ্রমে মুখে স্মিত হাসি টেনে
বললো 'আর একটু অপেক্ষা কর প্রিয়া'
তোমার উঠোন ভরিয়ে দেবো অঘ্রানে জেগে ওঠা
নতুন ফসলের উর্বর জমির সোনালী শস্যে,
হৃদয়ের ভাঁজ খুলে ঠোঁটে ছোঁয়াবো প্রিয় স্বাধীনতা ।

সেই স্বপ্নের অপেক্ষায় থাকবো,
শব্দমালা ঢেলে পংক্তিমালা সাজিয়ে
অন্তহীন শান্তির বর্ষণে দেহের ভাঁজে
লিখবে ভালবাসি প্রিয়া,
বড় ভালবাসি
ভালবাসি ।

দু'হাতে আঁধার কেটে

(ফেরদৌস জেসমীন)

গতকাল,
আশ্চর্য এক রাত ছিল,
দু'হাতে আঁধার কেটে স্বপ্নের আলোতে
সম্পূর্ণ অপরিচিত অচেনা অনুভূতির মোহনায়
তোমার মুখোমুখি কাছাকাছি,
কপালে চুমো খেয়ে ঠোঁটে সুখ খুঁজে
মৌরীর গন্ধমাথা মাতাল বাতাসে

ভালবাসার উষ্ণতায় সর্বাঙ্গে সেতারের সুরে,
নিয়ে গেলে বিচূর্ণ ক্রিয়ার দিকে
প্রাণবন্ত উত্তেজনায় অন্য জীবনে ।

গতকাল,
আশ্চর্য এক রাত ছিল,
তোমার স্পন্দন প্রাণের মমতায়
নতুন আগ্রহে আলোড়ন তুলেছিল,
লাজুক নয়নে শাড়ির আঁচলে ঢেউ খেয়ে
সুগন্ধ ছড়িয়ে দু'হাতে আঁধার কেটে
পৃথিবীর সব অন্ধকারের পর্দা ঠেলে
আলোটুকু চেয়েছি তোমার কাছে,
এই দুর্লভ জোনাকির খেলায়
স্বপ্নের নদীতে পানকৌড়ী আনন্দে নেচে উঠে ।

গতকাল,
আশ্চর্য এক রাত ছিল,
প্রাণের স্রোতে জ্যোৎস্নাময়ী জেগে উঠে
ঘ্রানমুগ্ধ রূপালী চাঁদে বাসর সাজায়
মুগ্ধ আয়োজনে শাপলা ফুলের বিছানায়,
চোখ, মুখ, বাহু, যৌবনবতী শরীর
ভাললাগার উষ্ণতায় দৃপ্ত অহংকারে
বসন্ত কেঁপে ওঠে অধর ছুঁয়ে হাসির তিলকে,
তোমার নিশ্বাস আলোড়ন তুলেছিল
হিম হয়ে যাওয়া স্তন্যে ।

অন্তরাল

গুলশান আরা কাজী

ট্যাক্সিটা ধানমন্ডির ২৭ নম্বর রোডের শেষ বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়ালো। বিরাট লোহার দরজা, বন্ধ। বিশালকার তালা ঝুলছে, মরচে পড়ে গেছে তালায়, মনে হয় বহুদিন এই দরজা খোলা হয় নি। স্বপন ট্যাক্সি থেকে নেমে হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে রইল। লোহার দরজার ওপরে আস্তর দিয়ে অর্ধচন্দ্র তৈরী করা, তার ওপর খোদাই করে নাম লেখা স্বপন–শান্তি নীড়। শ্যাওলা পড়ে লেখাটা কেমন অস্পষ্ট হয়ে গেছে। ইঁটের দেয়ালের মাঝে মাঝে আস্তর ভেঙে গেছে, শ্যাওলা জমে গেছে। আমগাছটার ডালগুলো দরজার ওপর চাঁদোয়ার মতো ঝুলছে। মন্ত্রমুগ্ধের মতো স্বপন প্রদক্ষিণ করছিল বাড়ির বাইরেটা। হঠাৎ একটা কাক কা কা করতে কারতে উড়ে গেল। এতক্ষণে স্বপন তার সম্বিত ফিরে পেল। দরজার বেল টিপলো একবার, দুইবার, তিনবার। তবে কি কেউ এখন এখানে থাকে না? অবশেষে সজোরে দরজায় ধাক্কা দিতে লাগলো। মনে হচ্ছে কে যেন আসছে। হঠাৎ পাশের ছোট দরজাটা খুলে একজন বৃদ্ধ গলা বার করে জিজ্ঞাসা করলো, কে, কে এসেছেন? এই কণ্ঠস্বর শুনে আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠলো স্বপন, কাছে গিয়ে বললো 'এ কি মালেক কাকা, আমি স্বপন, চিনতে পারছ না? মালেক চমকে ওঠে, হঠাৎ বৃদ্ধের বিবর্ণ চেহারা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, কে? ছোট বাবু? আজকাল চোখে একটু কম দেখছি, তাই তোমাকে চিনতে পারিনি, এসো এসো ছোটবাবু ভেতরে এসো। তুমি যে আসছ, খবর দাওনি কেন? স্বপন বলে, হঠাৎই এলাম, ভাবলাম তোমাদের চমকে দেই। কই, খোলো এই দরজাটা, মালগুলোতো ঢোকাতে হবে।

মালেক অনেকটা অপরাধীর মতোই বললো, – বাবু ওই তালার চাবিটা যে কোথায় আছে জানি না, বহুদিন তো দরজাটা খোলা হয় নি, তুমি এই ছোট দরজা দিয়েই ভেতরে এসো, আমি তোমার মাল নিয়ে আসছি।

স্বপন বাড়ির আঙিনায় এসে দাঁড়ায়, অনেকটা জড়ো পদার্থের মতো নিষ্পলক তাকিয়ে থাকে বাড়ির দিকে। মালেক ততক্ষণে মাল ভেতরে নিয়ে এসেছে। স্বপনের দিকে তাকিয়ে মালেক বলে, – কি ছোটবাবু কি ভাবছ? চলো ভেতরে চলো। তুমি বাইরের ঘরটায় একটু বসো, আমি এক্ষুনি তোমার ঘরের চাবি নিয়ে আসছি। ছোট খাট বৃদ্ধ মানুষটি তীরের বেগে ছুটে গেল চাবি আনতে। ছুটতে ছুটতে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বললো– চলো ছোটবাবু তোমার ঘরে। তুমি হাতমুখ ধুয়ে কিছু খেয়ে একটু জিরিয়ে নাও, তারপর তোমার সব কথা শুনবো।

স্বপন ভাবে বেশতো পরিষ্কার ঘরটা, কোনো ধুলোবালি নেই, পরিষ্কার বিছানা পাতা, তবে কি মালেক কাকা জানতো যে আমি আসছি? মালেক হয়ত স্বপনের মানের কথাটা বুঝতে পেরেছিল, তাই নিজে থেকেই বলে উঠলো, আমি রোজ তোমাদের সকলের ঘর ঝেড়ে পুছে রাখি, কিছুদিন পরপর বিছানার চাঁদর, বালিশের খোল সব ধুয়ে আবার পাল্টে রাখি। স্বপন সম্পূর্ণ নির্বাক, কি বলবে কিছুই বুঝে উঠতে পারছিল না। হঠাৎ করে কিছুটা অবসাদ অনূভব করল, ফ্যানটা ছেড়ে দিয়ে বিছানায় গা এলিয়ে দিতেই ও ঘুমিয়ে পড়লো। ঘুম ভেঙে দেখে ওর টেবিলের ওপর নাস্তা সাজানো। হাতমুখ ধুয়ে নাস্তা খেয়ে একটু চাঙ্গা হয়ে উঠলো স্বপন। নিজের ঘরটাকে নতুন করে আবিষ্কার করতে লাগল। দেয়াল আলমিরাতে ওর ট্রফি আর মেডেলগুলো তেমনি সাজান রয়েছে, ওর পড়ার টেবিলে কলমদানি, বকুলের ছবি, কয়েকটা বই ঠিক তেমনি রয়েছে। ওর খাটের মাথার কাছে দুটো ফলক টাঙানো রয়েছে, একটা ভাষা আন্দোলনের শহীদদের স্মরণে আর একটা মুক্তিযুদ্ধের

শহীদদের স্মরণে। এই দুটো ফলকই বকুল তাকে উপহার দিয়েছিলো। ভাষা আন্দোলনের ফলকের পাশে অর্দ্ধচন্দ্র করে একটা অলঙ্কার করা, তার পাশে সাল লেখা ১৯৭৫, ১৯৭৬, ১৯৭৭, ১৯৭৮। প্রতিটি সালের সাথে একটা করে ফুলের ডাঁটা সেলাই করে গাঁথা।

১৯৭৪ সালে ২১শে ফেব্রুয়ারি প্রভাত ফেরিতে বকুলের সাথে স্বপনের পরিচয় হয়। পরিচয় থেকে বন্ধুত্ব, তারপর ঘনিষ্ঠতা। সেই থেকে প্রতিবছর ওরা একসাথে ২১শে ফেব্রুয়ারির প্রভাত ফেরিতে যেত। সাথে শান্তি, স্বপনের বোন, সেও যেত। শহীদদের স্মরণে ওরা একটা ফুলের তোড়া নিয়ে যেত। তা থেকে দু'টো ফুল ছিঁড়ে বকুল একটা নিত নিজে আর একটা স্বপনের ঘরে ওই ফলকের ওপর সেলাই করে দিয়ে যেত। পর পর চার বছরের সালের পাশে ফুলের ডাঁটাগুলো আজও সেলাই করা, ফুলগুলো ঝরে গেছে। ২১শে ফেব্রুয়ারির দিনে বকুল স্বপনদের বাড়িতেই খাওয়া দাওয়া করত। খাবার টেবিলে ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে তার ভূমিকা, এছাড়া নানা বাংলা সাহিত্য ও সাহিত্যিকের ওপর আলোচনা হতো। স্বপনের বাবা কবির সাহেব সারা পৃথিবী ভ্রমণ করেছেন, কিন্তু বাঙালির জাতীয়তাবোধ, বাঙালির ঐতিহ্য ছিল তার গৌরব, কবি জীবনানন্দ দাশের কবিতা 'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি- তাই আমি পৃথিবীর মুখ দেখিতে চাই না আর' –এটা ছিল তাঁর সব চাইতে প্রিয় কবিতা। তিনি বলতেন বাংলা ভাষায় মানুষের সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলো প্রকাশের যতো শব্দ রয়েছে, আর কোনো ভাষায় তা নেই। উনি বলতেন - এই ধরো বিরহ, অভিমান, লজ্জা, উদ্দাম এইসব শব্দের সমতূল্য ইংরেজী শব্দ বার করতে পারবে? পারবে না তো? এইসব আলোচনায় বকুলও সক্রিয় অংশ নিতো। বকুলকে স্বপনের মা বাবা খুব আদর করতেন। পহেলা বৈশাখের মেলাতেও বকুল, স্বপন ও শান্তি একসাথে মেলায় যেত। লালপেড়ে শাড়ী পড়ে, মাথায় ফুল আর পায়ে আলতা দিয়ে বকুল যখন আসত তখন স্বপনের মা প্রাণ ভরে ওকে দেখতেন, স্বপনের মনে হতো পৃথিবীর সব রূপ আর লাবণ্য যেন বকুলের ওপর এসে থমকে গেছে।

অতীতের মাঝে স্বপন আস্তে আস্তে হারিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ দমকা হাওয়ায় জানালার পাটটা খুলে গেল। কয়েকটা কুবতর কোথা থেকে যেন উড়ে গেল। স্বপন জোর গলায় ডাকল মালেক কাকা, একটু এদিকে এসো না, সবগুলো ঘরের দরজা খুলে দাও না, আমি একটু ঘুরে ঘুরে বাড়িটা দেখি। সারা বাড়ির দরজা, জানালা খুলে গেল, হঠাৎ করেই যেন আবার প্রাণের সঞ্চার হলো স্বপন-শান্তি নীড়ে। শন্ শন্ হাওয়া দরজা জানালার আনাচ-কানাচ দিয়ে খেলা করতে লাগল, স্বপনের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো, কানে বাজতে লাগল 'শূন্য আজি গুল বাগিচায় যায় কোঁদ দখিন হাওয়া'। পায়ে চটি পরে চটাস চটাস শব্দ করে বারান্দা দিয়ে হেঁটে হেঁটে এঘর থেকে ওঘর করতে লাগল স্বপন। ছুটে গেল শান্তির ঘরে। ওর ঘরেও ওর ট্রফি, বইপত্র তেমনি সাজানো রয়েছে। দেয়ালে ওর টেথিসকোপটা তখনো ঝুলছে। কবির সাহেবের অনেক আশা ছিলো শান্তি যখন ডাক্তার হবে, কবির সাহেব ওকে একটা বিরাট ক্লিনিক খুলে দেবেন, শান্তি সেখানে বিনা পয়সায় গরিবের চিকিৎসা করবে। কিন্তু শান্তি চলে গেল অস্ট্রোলিয়াতে। কবির সাহেব নিজে ছিলো ইলেকট্রিক্যাল ইন্জিনিয়ার।

তিনি মিরপুরে একটা ওয়ার্কশপ তৈরি করে গেছেন, সেখানে হাতে কলমে কাজ শিখে লোকে, রেডিও, টেলিভিশন, মাইক্রওয়েভ ওভেন এ সব মেরামত এবং তৈরি করতে শেখে। অনেক লোক কাজ করে সেই কারখানায়। অত্যন্ত আশাবাদী ছিলেন কবির সাহেব, দেশের মুখ একদিন উজ্জ্বল হবেই এই ছিল তাঁর আশা।

বারান্দা দিয়ে হেঁটে চললো স্বপন, মা-বাবার ঘরের দিকে। হঠাৎ মনে হলো মা যেন ডাকছেন – কি রে এখনও খেতে এলি না? কলেজের যে দেরি হয়ে যাবে। বাবা যেন ইজি চেয়ারে বসে পত্রিকা পড়ছেন, চশমাটা একটু করে নামিয়ে বললেন 'ঘুম থেকে কেন এত দেরি করে ওঠা হয়? রাতের আড্ডাটা একটু কমিয়ে দিলে হয় না'? শান্তি চিৎকার করে বলে, ভাইয়ার জন্য আমার রোজ দেরি হয়ে যায়, আমার আলাদা গাড়ি আর ড্রাইভার দরকার। স্বপন শান্তির দিকে ফিরে মুখে ভেঙচি কাটে, তারপর বই নিয়ে দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যায়।

নিচে বসার ঘরে যায় স্বপন, দেয়াল আলমিরাতে ঠাসা বই। ঘরের আনাচে কানাচে সাজানো রয়েছে সারা পৃথিবী থেকে সংগ্রহ করে আনা জিনিস। রকিং দেয়ারে বসে দুলতে থাকে স্বপন, সেই দোলার ছন্দে ছন্দে

কানে যেন ভেসে আসে তবলার শব্দ, তার সাথে ঘুঙুর। স্বপন তবলা বাজাচ্ছে আর শান্তি নাচছে। সাথে সেতার ও বাঁশীর শব্দ। কি সেই ছন্দ ও সুরের মাদকতা। স্বপন হঠাৎ করেই যেন ঘেমে ওঠে। আবার ডাকে, মালেক কাকা একটু এসো না। মালেক ছুটে আসে, কি ছোটবাবু, কি হয়েছে? কিছু লাগবে? স্বপন নিজেকে একটু সংযত করে নেয় তারপর জিজ্ঞাসা করে, আচ্ছা তোমার দু'টো ছেলে মেয়ে, ওরা এখন কোথায়? মালেক বলে, বাবু, এখানেই থাকে ওরা।

স্বপন আবার জিজ্ঞাসা করে– ওরা কি করছে?

মালেক বলে, ছেলেটা কম্পিউটার সায়েন্স-এ পাশ করে একটা কোম্পানিতে চাকুরী করছে, আর মেয়েটা ডাক্তার হয়ে একটা ক্লিনিকে চাকুরী নিয়েছে। কথাটা বলতে গিয়ে মালেক ভাবে গদগদ হয়ে যায়।

স্বপন বলে, বাঃ বাঃ খুব খুশী হলাম এটা শুনে।

মালেক বলে – সন্ধের সময় ওরা ফিরলেই ওদের নিয়ে আসব তোমার সাথে দেখা করতে। তোমার কাকীমা তোমার জন্য রান্না করছে। তোমার সামনে আসতে ও ভয় পাচ্ছে, বলে আমেরিকান সাহেব, আমার কি আর চিনবে? স্বপন হেসে বলে 'ঠিক আছে আমিই যাব কাকীমার সাথে দেখা করতে। মালেক আবার বলে– বাবু তোমাদের দয়ায় আজ আমরা সুখের মুখ দেখেছি। তোমরা আমাদের এই বাগান বাড়িতে থাকতে দিয়েছ বলেই না আমরা বেঁচেছি। আজকাল বাড়িঘরের যা ভাড়া। সেই যে উত্তরায় ভাড়াটে, তারা প্রথম দু'বছর ভাড়া দিল তারপর ভাড়া দেয়া বন্ধ করে দিল। আমি ভাড়াটা ব্যাংকে রেখেছি, তোমাকে সব কাগজ পত্র বুঝিয়ে দেব।

স্বপন বলে– কাকা বাবু, এসব নিয়ে তুমি মোটেই অস্থির হবে না। সত্যি, তোমার দুই ছেলেমেয়ে মানুষ হয়ে গেছে ভাবতে আমার খুব ভালো লাগছে।

মালেক বলে– মানুষ হয়েছে তোমাদের দোয়ায়, তবে কি জানো? আজকালকার যা হাওয়া, কেবল বলে আমেরিকা যাব। স্বপন হেসে বলে, তো তুমি কি বলো?

মালেক বলে– আমি বলি আমি বেঁচে থাকতে তা হতে দেব না। ওদেশ যাদুর দেশ, ওখানে গেলে কেউ আর ফেরে না। দেশের ছেলে মেয়ে, দেশে খেটে খাবে, অন্যের দেশের গোলামী করবে কেন? তোমাদের মতো তো ওরা খানদানী ঘরে জন্মায় নি, ওদের খান্দান, সামাজিক মর্যাদা ওদের নিজেদের গড়ে নিতে হবে।

স্বপন হঠাৎ করেই দাঁড়িয়ে পড়ে, অস্থিরভাবে পায়চারী করতে থাকে। মালেক আলোচনার ধারাটা পাল্টে দিয়ে বলে, – বেলা অনেক হলো বাবু, গোসল করে খেয়ে নাও। স্বপন যেন সে কথাটা শুনতে পায়না, মালেককে বলে– 'কাল রাতে বাড়িতে একটা পার্টির ব্যাবস্থা কর কাকা। আমি তোমাকে নিয়ে বাজারে যাব। গাড়িটার কি অবস্থা? তোমার চেনা কোনো ড্রাইভার আছে? মালেকের চোখে মুখে আনন্দের ঢেউ বয়ে গেল, মালেক গদ গদ হয়ে বলে– হ্যাঁ বাবু আমার পরিচিত ড্রাইভার আছে, এক্ষুনি খবর দিয়ে আসছি।

পরদিন বিরাট লোহার দরজা খুলে গেল। স্বপন–শান্তি নীড়ে আবার আনন্দের আর কলকাকলির ঢেউ বয়ে চললো। বিরাট জমজমাট পার্টি, স্বপনের আত্মীয়-স্বজন ভেঙে পড়েছে। সবার মনে একই প্রশ্ন। বংশের একমাত্র বাতি স্বপন অবশেষে হয়ত দেশে ফিরে এলো। স্বপনই বংশের একমাত্র পুত্রসন্তান, বংশের প্রদীপ। রাজার রাজপাট, মান সম্ভ্রম, বংশ মর্যাদা সব কিছু উপক্ষো করে স্বপন এতদিন তো আমেরিকায় ছিল, এবারে হয়তো ও সম্বিত ফিরে পেলো। ধবলকায় আমেরিকানকে না হয় বিয়ে করেছে, তাতে কি এসে যায় ছেলেদের, এখানে আবার বিয়ে করবে, এবারে হবে আসল বিয়ে। বিশ বছর আগে স্বপন দেশ ছেড়েছিল, মাঝে শুধু একবার এসেছিল দেশে বছর দশেক আগে ওর বাবার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে। বন্ধুবান্ধবেরা কে কোথায় ছিটকে পড়েছে, আত্মীয় স্বজনেরাও স্বপনকে ভুলতে বসেছিল।

অনেক হৈ চৈ, হাসাহাসি, স্মৃতি রোমন্থন, তারপর পার্টি শেষ। চারিদিকে আবারো সেই সীমাহীন শূন্যতা, সীমাহীন স্তব্ধতা। মালেকের ছেলে মেয়ের সাথে অনেকটা সময় কাটায় স্বপন, ওদেরকে দেখে ওর মনটা গর্বে ভরে ওঠে, এরাই সত্যি অর্থে দেশের ভবিষ্যৎ।

স্বপন মালেককে বলে – কাকা আমি কিন্তু কাল ভোরে প্রভাত ফেরিতে যাব। মালেক চমকে ওঠে, ওরে বাবা, যা ভিড় হয়, তুমি একেবারে চিঁড়েচেপটা হয়ে যাবে। সেটা হবে না ছোটবাবু।

স্বপন বলে, ২১শে ফেব্রুয়ারী প্রভাত ফেরিতে যাব বলেই আমি এই সময় এসেছি কাকা। বিশ বছর পর এলাম এই সময়ে, তুমি আমায় মানা করতে পারবে না। মালেক বলে– আরে তুমি দেখি সেই ছেলেবেলার মতোই জেদ ধরলে, তাহলে ঠিক আছে, তুমি একা যাবে না, আমার ছেলে টুটুল যাবে তোমার সাথে।

স্বপন বলে, ঠিক আছে তাই তবে, আমাকে কিন্তু তুমি ভোরে তুলে দেবে।

সেদিন রাতে ভালো করে ঘুম হলোনা স্বপনের, মনে মনে সুর ভাজতে লাগলো 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি'।

পরদিন খুব ভোরে স্বপন আর টুটুল চললো প্রভাত ফেরিতে। পাজামা, পাঞ্জাবী আর পায়ে চটি পরে খুব ভালো গালছিল স্বপনের, স্মৃতির সিঁড়ি বেয়ে চলে গেল সেই ২০ বছর আগে। টুকিটাকি স্মৃতির কণা ওর মনের বাতায়নে উঁকি দিতে লাগল। হাতে একটা ফুলের তোড়া নিয়ে ও চললো শহীদ মিনারের দিকে। টুটুলও ওর সাথে সাথে। কাকাবাবু ঠিকই বলেছিলেন, প্রচণ্ড ভিড় আর ঠেলাঠেলি। শহীদ মিনারে উঠতে গিয়ে এক মহিলার সাথে ধাক্কা লাগে স্বপনের। তার হাতেও একটা ফুলের তোড়া ছিলো, ধাক্কা লেগে তোড়াটা ছিটকে পড়ে। স্বপন অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে তোড়াটা মহিলার হাতে তুলে দেয়। চোখে চোখ পড়তেই ভীষণ রোমাঞ্চ আর রহস্যের অনুভূতি মুহূর্তে স্বপনের সমস্ত শিরা উপশিরায় প্লাবন বইয়ে দেয়। কাঁচা পাকা চুল, আলতো ভাবে ঘোমটা দেয়া, কে এই মহিলা? প্রচণ্ড ভিড়ের চাপে আবার সব এলোমেলো হয়ে যায়। স্বপন পাগলের মতো এদিক ওদিক তাকাতে থাকে, কাকে যেন ও প্রাণপনে খুঁজতে থাকে। কোথায় গেল সেই মহিলা, সে কেন একটা ধন্যবাদ দিলো না স্বপনকে, তাহলে ওর কণ্ঠস্বরটা শুনতে পারত স্বপন। শুধু একবার ওর চোখের দিকে তাকিয়ে কেন ও হারিয়ে গেল? বিশাল জনস্রোতের দেয়ালে আছড়ে পড়তে লাগলো স্বপনের মনের প্রশ্নের ঢেউ, কে এই মহিলা? আস্তে আস্তে ভিড় কমতে লাগল, স্বপন শহীদ মিনারে ফুল দিয়ে একটা ফুল ছিঁড়ে আনলো। সারাটা পথ কেমন বিভোর হয়ে ছিল স্বপন, টুটুলের অনেক কথাই ও যেন শুনতে পায় নি। বাড়ি এসে ভাষা আন্দোলনের ফলকে ওর ফুলটা এঁটে দিল, পাশে সাল লিখলো ২০০০। কি ভীষণ আকুলতা স্বপনের সমস্ত স্নায়ুকে তোলপাড় করতে থাকে। বালিশের তলায় ওর সিন্দুকের চাবিটা তেমনি আছে। স্বপন অস্থির ভাবে সিন্দুক খোলে, এলোমেলো জিনিস হাতড়ে একটা গয়নার বাক্স বার করে, সেটা খুলে দেখে সেই শীতাহার, ঠিক তেমনি উজ্জ্বল, তেমনি তার বংশের ইতিহাস বুকে বেঁধে রয়েছে নীরবে। দুই হাতে শীতাহারটা জড়িয়ে ধরে, মায়ের শেষ কথাগুলো কানে বাজতে থাকে– 'বাবা আমার বড় দুঃখ থেকে গেল যে তোমায় আমি সংসারী দেখে যেতে পারলাম না। বকুল মেয়েটা বড় ভাল, এই শীতাহারটা তুমি ওকে নিজহাতে পরিয়ে দেবে তোমাদের বিয়ের সময়। আমি বেঁচে থাকলে আমিই পরিয়ে দিতাম, আমার অনুপস্থিতিতে এই গুরু দায়িত্ব আমি তোমাকে দিলাম। এই হারটা তোমার দাদির মায়ের, তিন বংশ ধরে রয়েছে এই হার, বংশের আশির্বাদ ও ঐতিহ্য বহন করছে এই হার। যত্ন করে রেখ। আমি জানি বকুল এই হারের পূর্ণ মর্যাদা দিতে পারবে। শ্রাবণের ঢল যেন বয়ে চললো স্বপনের চোখে।

মা মারা যাবার কিছুদিন পরই স্বপন আমেরিকার পথে পাড়ি দেয়, বকুলকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে গিয়েছিল শিগগীরই ও ফিরে আসবে। প্রথম প্রথম বকুলকে চিঠি লিখত, কবিতা লিখত, টেলিফোনে ঘন ঘন কথা বলতো। প্রথমে সপ্তাহে দুটো চিঠি, দুটো ফোন, তারপর সপ্তাহে একটা, তারপর মাসে একটা, ছ–মাসে একটা, তারপর সীমাহীন নিঃস্তব্দতা। ধবলকায়, সোনালী চুল আর নীল চোখের গভীরে হারিয়ে গেল স্বপন। কিন্তু- আজ কার চোখে চোখ পড়ে সমস্ত দেহে শিহরণ জাগলো স্বপনের? স্বপন জানালার দিকে তাকিয়ে অন্তহীন আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করে দাঁড়িয়ে রইল, হাতে ধরা শীতাহারটা।

হঠাৎ মালেক ডাক দিল– বাবু, কিছু নাস্তা করবেন? স্বপন চমকে উঠলো, কিন্তু তার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে জিজ্ঞাসা করলো, আচ্ছা মালেক কাকা বকুলের কথা মনে আছে তোমার?

মালেক বলে–

– কেন মনে থাকবেনা ছোটবাবু, বকুল দিদিমনি বড় ভালো মেয়ে ছিল । তুমি চলে যাবার পরও ও প্রায়ই আসত, শান্তি দিদিমনির সাথে অনেক সময় কাটাত, বড় বাবুর সাথে গল্প করত । শান্তি দিদিমনি চলে যাবার পরও আসত, বড় বাবুর খাওয়া দাওয়া, শরীর স্বাস্থ্য সবকিছুর খবর রাখত ।

স্বপন পিছন ফিরে দাঁড়িয়েই জিজ্ঞাসা করে – বকুল এখন কোথায় আছো জানো?
মালেক বলে-
না ছোটবাবু । একবার শুনলাম ওর নাকি বিয়ে, তার আগে বকুল দিদিমনি এসেছিলেন বড়বাবুর সাথে দেখা করতে । কি কথা হয়েছিল জানিনা, শুধু দেখলাম দিদিমনি চোখ মুছতে মুছতে বেরিয়ে গেল । তারপর আর ওকে দেখিনি ।
স্বপন এতক্ষনে মালেকের প্রশ্নের উত্তর দিল ।
– হ্যাঁ কাকা আমি একটু চা খাব ।
মালেক চলে গেল, স্বপন এতক্ষনে নিজেকে সংযত করে নিয়েছে, শীতাহারটা বালিশের তলায় রেখে বিছানায় গা এলিয়ে দিল ।
মালেক চা আর নাস্তা টেবিলে এনে রাখল ।
দরজা দিয়ে বেরিয়ে যেতে যেতে মালেক হঠাৎ থেমে গেল,
–বাবু, সকলে বলছে তুমি এবারে দেশে ফিরে এসেছ, আর যাবে না, সত্যি নাকি?
হাসি আর আনন্দের বন্যায় বৃদ্ধের বিবর্ণ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো ।
স্বপন গম্ভীর গলায় বলে–
– না কাকাবাবু, এক সপ্তাহ পরই আমি চলে যাব ।
মালেক এবার উত্তেজিত হয়ে বলে ওঠে–
– কেন যাবে বাবু? দেশের ছেলে দেশে থেকে যাও । রাজার রাজপাট পড়ে রয়েছে তোমার জন্য । তোমার বাব-দাদার চৌদ্দপুরুষ যে ঐতিহ্য, মান-সম্ভ্রম যে ইতিহাস গড়ে গেছেন, তা তুমি পায়ে দলে যাবে? তুমিও বংশের একমাত্র প্রদীপ । অন্যের দেশে কেন গোলামি করতে যাবে? আমি তো এতদিন যক্ষের ধনের মতো সবকিছু আগলে রেখেছি, আমার আর ক'টা দিন আছে? আমি মরে গেলে তো দশ ভুতে তোমার সব লুটে পুটে খাবে । দেশের বাড়ির অনেক সম্পত্তি তো হাতছাড়া হয়েই গেছে, যেওনা বাবু ।
স্বপন গরম চায়ের কাপটা হাতে নিয়ে জানালার সামনে এসে দাঁড়ালো, ওর চোখ দু'টো বার বারই ঝাপসা হয়ে আসছিল ।
২১শে ফেব্রুয়ারি ২০০০ সাল, সূর্য তখন মধ্যগগনে, তিরস্কারের আগুন ঝরাচ্ছে যেন স্বপনের ওপর । ১৯৫২ সালের এই দিনে কৃষ্ণচূড়ার লাল রঙ রাঙিয়ে ছিল আকাশ আর শহীদদের লাল রক্ত রাঙিয়ে ছিল ঢাকার রাজপথ । আজ স্বপনের ক্ষত-বিক্ষত বক্ষপটে লাল রঙ ওর হৃদয়ের সৈকতে আছড়ে পড়তে থাকে । দম আটকে আসতে থাকে স্বপনের । মালেক অনেকক্ষন দাঁড়িয়ে রইলো কোনো উত্তরের আশায়, অবশেষে নীরবে বেরিয়ে গেল । গরম চায়ের ধোঁয়া স্বপনের চশমাকে ঝাপসা করে দিতে থাকে ।

হায়দার খান

মন্দ্র সপ্তক

(১)
ষড়জেই সহজঃ সুর থেকে সুরান্তরে
উচ্চগ্রাম অন্বেষণ
সময় বা সুযোগ তার কোথায় এখন?
তা'হলে - কি ভেবে কোন সে উল্লাসে
সোরা আর গন্ধকের খোঁজে
ছুটে গেল দুরন্ত যুবক মাঝরাতে ওখানে?
আজরাতে--আজ এই ফাগুনের রাতে?

(২)
চেয়ে দেখ লেকের ওপারে নির্জন চাঁদ
স্বচ্ছজলে ছায়া নড়ে
বুড়ী ক্রীতদাসী যেন
আনমনে হাত পা নাড়িয়ে
কাজ করে মুখে তার
বয়সের ভাঁজ
হয়তো বা কোমল রেখাব ছুঁয়ে গান্ধারে চলেছে
কোন এক সন্ধ্যার রাগ
অন্তরাগ আকাশে বিলীন
সব পাখী উড়ে গেছে--ঘরে নয় অন্য কোনখানে
অদ্ভূত নিজ্‌ঝুম সাঁঝে তবু চাঁদ
শুক্লা একাদশীর চাঁদ
নীপকুঞ্জে নিরর্থক নিশি গন্ধার সন্ধানে
পাতে ফাঁদ
কেবলি ডেকে ডেকে ফেরে
“আয় আয়”, বলে, “কাছে আয়”
তবে কি কবি ও কবিতা ভূক আজ সন্ধ্যায়
বৃদ্ধা ক্রীতদাসী চাঁদ?

(৩)
হয়তো বা নক্ষত্র আর নীহারিকা জানে
ক্যানসার সেলের মত কিভাবে
চন্দ্রভূক রাত বেড়ে বেড়ে যায়

বিরহী-বিরহিণী জেগে রয় পাশাপাশি
একই বিছানায়
সঙ্গম-ক্লান্ত নিরক্ত বেদনায়
শতাব্দীর শূন্যতার রোল

রাতের শিফটে জেগে আছে
ক্লান্ত শ্রমিকের দল
ইদানীং ঝিঁ ঝিঁ নেই
বর্ষার অক্লান্ত বর্ষণেও
মত্ত দাদুরী ডাহুকি
ডাকে না, ডাকে না, ডাকে না আর
কার্তিক আভার চাঁদ
মরা ফাল্গুন মাসে
শুধু ডেকে যায়
গান্ধারে গান্ধারীর আবেদন
বুভুক্ষের মত অবিরাম
"আয় আয়, কাছে আয়, আয় আয়", বলে ।

(৪)
হৃদয় অরণ্য এক জ্বলে দাবানল
কড়িমধ্যম থেকে ফেরা তো যাবে না আর
আপ্লুত ষড়জে
হতাশন দাবাগ্নি অনলে ছারখার
ছিন্নভিন্ন সংসার বাংলার

রাতের গহীন কালো
কাফন অকলঙ্ক শহীদের
হৃদয়ের শ্বেত-রশ্মি
রজনীগন্ধার গন্ধে মিশে
যায়-উজ্জ্বল চোখের
তারা কবরের নাম
ভেদ করে
তবুও ঝিলিক দিয়ে যাবে?

ভোরের সানাই আর নতুন জীবনের নহবত
নষ্ট বীজ বিধ্বংসী প্রহরের সুকন্ঠ - কল্পনা?
বিমৃষ্ট বিমৃশ্যকারী মনের নির্বেদ?
আমি একা ত্রাসমত্ত - অজগর অন্ধকার
বুভুক্ষু তৃষ্ণার্ত সর্বদাই আমাদের সকল সময়
আমাদেরই শবদেহ সোল্লাসে কুরে কুরে খায়

কোথায়, কোথায় তুমি, হে নগ্ন নর্তকী
আমাকে আসবমত্ত অথবা
নিদ্রামগ্না করে দিয়ে যাও

(৫)
নিদ্রাহারা রাতের এ সঙ্গীত
"লাগ লাগ লাগ লাগ
লাগরে ভেল্কী লাগ"
কিন্তু হায় পঞ্চমে কণ্ঠ অচল
মাথায় ছন্দে ছন্দে নিয়মিত
বেজে যায়
প্রহরে প্রহরে
ঘন্টা প্রহরায়

বাইরে বিনিদ্র সাইরেন
ডেকে ডেকে যায়
অতন্দ্র প্রহরায়
লস্ অ্যাঞ্জেলেস্--দেবদূতের নগর
নীরোর রোমের মত--আগুনের পাখা
ঝাপটান স্বর্গীয় প্রেতগণ
মধ্যপ্রাচ্যে শতাব্দীর অন্ধকারে
নমরুদের কবরের পাশে
বাদুরেরা ডানা ঝাপটায়
শাদ্দাদের বেহেশ্‌ত্ তবুও তো টিকে আছে
রক্তমাখা দেয়ালের, আর্শীর আড়ালে
কোন মন ভোলানো তিলিস্‌ম্ আজ
কোন মায়া অরণ্যের প্রেম বিলাসের সুরে
বাঁধবে তুমি আজ
এই অনিকেত অতন্দ্র কৃষ্ণ প্রহরের গান?
মুখ খোল, বল, বলে যাও
হে কৃষ্ণপক্ষ দেবদূত আমায়।

(৬)
আন্দোলিত ধৈবতে ভৈরবের বৈরাগ্যের সুর
'মেহের কী নজর'--কিন্তু মোহর কী কদর
গোলাম হোসেন মোসাহেব ইতিহাসবিদ আপাতত:
বেকার রকে আড্ডা দেয়
বাংলার মস্‌নদ তবু এখনও অটুট আর
খোয়াজ খিজীর
এখনও সোঁদরবনে ঘুমের শিকার

বনবিবি
বনে শুয়ে ওইতো এখনই
কেঁদে ফিরে গেলো কিছু মাসুম শিশুরা
মন্দির-মসজিদে-চার্চ-প্যাগোডায় লুটায় ভক্তেরা
সন্তরা কোথায় যে গেছেন হয়তো বা মহাপ্রস্থানেই কে জানে
রাতভোর মুদ্রাগোণা ধর্ষণে ক্লান্ত
কিশোরী গণিকা
ম্লানচোখে সূর্য ওঠার ঠিক একটু আগেই
শয্যায় লুটায়
কালোপরী নিদ্রাপরী
এখন আসে না আর
পালঙ্ক শূন্য আজ
মদনকুমার আর রাজকন্যার
কবি শুধু তন্দ্রাহারা, বিহ্বল, মাতাল, অবোধ
অরাজনৈতিক, লম্পট, নিষ্কম্প, নির্বিকার, নিস্পলক
অথচ হৃদয়ে তার সাইক্লোন, বঙ্গোপসাগরের জলোচ্ছ্বাস
দ্বিধায় শতধা তার শব্দের তূর্ণীর
সামনে ফণা তোলে কালসর্প, হায় লক্ষীন্দর
কোথায় পালাবেও

(৭)
নিষাদের মন মায়ামৃগে মজে আছে?
শুধুই মায়ামৃগে? স্বপ্নে যাদুতে?
পরধনলোভেমত্ত বাংলার সন্তানেরা ভ্রমে চরাচর
মাতে মৌতাতে আর খোঁয়ারী কাটায়
মাঝরাতে নিঃসঙ্গ আকাশের নিরুত্তাপ ছায়ায়
নিজেদের খোঁজে?

আত্মপ্রতিকৃতি দেখে নিউইয়র্ক লন্ডন বার্লিনে

(হায়দার খান)

দিয়ালে গ্রাফিতি
মাতালের প্রলাপে মুখর
হাজার বছরের এই পথ
হাঁটি হাঁটি করে শত ভুলের মাশুল গুণে
হাঁটুর অর্ধেক অবধি আজ
তারা সব ফুটপাথে দাঁড়িয়েছে উঠে ।
হে প্রেয়সী ক্রীতদাসী চাঁদ
আশ্বিনের কার্তিকের ফাল্গুনের
এখনও অফুরন্ত
জীবনের পরমলগণ
নিঃশ্চুপ নিস্তরঙ্গ এই অন্তরঙ্গ সাঁঝে
সময় ছুটে চলে দুর্দম দুর্বার
কল্প কল্প জুড়ে কল্পনার সাথে চল বাস করি
ষড়জেই যাই ফিরে চল সখী সহজেই তাহলে এবার ।

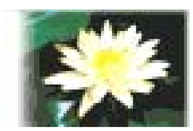

স্মৃতির পাতায় নজরুল

হারুণ চৌধুরী

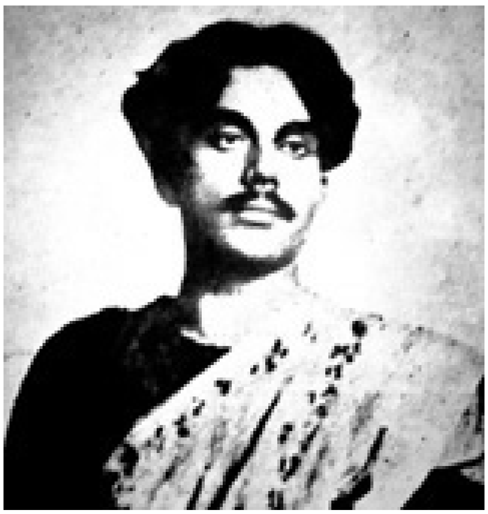

ঊনবিংশ শতাব্দীতে কবি কাজী নজরুল ইসলাম এসেছিলেন যুগের ধ্বনি হয়ে। তাই তো নজরুল যুগ স্রষ্টা। সঙ্গীতের স্রষ্টা নজরুল। প্রেমের স্রষ্টা নজরুল। নজরুল তার গানে, কবিতায়, সুরে সুন্দরকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। ১৮৯৯ সালের ২৪ মে ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬ বাংলা বছর বর্ধমান জেলার চুরুলিয়াতে জন্মগ্রহণ করেন। দিনটি ছিল বুধবার। তার পিতা ছিলেন ফকির আহম্মদ। মাত্র নয় বছর বয়সে নজরুলের পিতৃবিয়োগ হবার পরে আর্থিক অনটনের মধ্যে দিনযাপন করতে হয়। জীবিকা নির্বাহের প্রয়োজনে তিনি কিছুদিন মাজারের খাদেমের বৃত্তি গ্রহণ করেন। এর পাশাপাশি নজরুল মক্তবে লেখাপড়া চালিয়ে যান। ১৯১০ সালে তিনি লেটোর দলে যোগ দেন। দুঃখ তার জীবনের নিত্যসাথী ছিল বলেই বাল্য বয়সে নজরুলের নাম ছিল দুখু মিয়া। ছোট বয়স থেকেই হিন্দু ও মুসলিম উভয় ধর্মের মানুষের প্রতি তাঁর ছিল উদার মনোভাব। সকল ধর্মের মানুষকেই তিনি সম্মান করতেন।এত দুঃখ কষ্টের মধ্যেও দুখু মিঞা শৈশব থেকেই মানুষের বিপদে-আপদে সাহায্যের জন্য এগিয়ে যেতেন। অত্যন্ত খেয়ালী স্বভাবের ছিলেন। হৈ হুল্লোড় আড্ডা দিতে খুবই পছন্দ করতেন। হো-হো করে প্রাণ খুলে হাসতেন। গ্রামের আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া মক্তবে পড়ার সময় তার এক কাকা আরবি-ফার্সীতে পন্ডিত বজলে করিমের কাছে সেই ভাষার ওপর তালিম নেন। পরবর্তীতে দুখু মিঞা কবিতা লেখায় উৎসাহিত হন। তার অসাধারণ প্রতিভা দেখে কাকা বজলে করিম তার লেটোর দলে নজরুলকে ভর্তি করেন। সেই দলে যোগ দিয়ে তিনি বিভিন্ন ভাষার সংমিশ্রণে পালাগান রচনা করেন।

১৯১৩ সালে কবি আসানসোলের এক গার্ড সাহেবের বাড়িতে চাকরি নেন। সেই চাকরি থেকে ইস্তফা দিয়ে তিনি এই সময় একটি রুটির দোকানে চাকরি নেন। রুটির দোকানে কাজ করার সময় যখন কিশোর নজরুল ময়দা মাখার সময় সুর দিয়ে গান করতেন। এইসময় ময়মনসিংহ জেলার দরিরামপুরের এক পুলিশ সাব ইন্সপেক্টর কাজী রফিক উল্লাহর সাথে তার পরিচয় হয়। কাজী সাহেব কবির গানে মুগ্ধ হয়ে ১৯১৮ সালে কবিকে নিয়ে আসেন ময়মনসিংহে। দরিরাম পুর উচ্চ বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তি করে দেন। সেখানে তিনি বছর খানেক ছিলেন। চির চঞ্চল আমাদের দুখু মিঞা আবার নতুন পথের সন্ধানে চঞ্চল হয়ে উঠলেন। তিনি আবার চলে এলেন সিয়ারশোলে। ভর্তি হলেন সিয়ারশোল উচ্চ বিদ্যালয়ে। এর মাঝে চলে যান মায়ারুন স্কুলে। আবার সিয়ারশোলে প্রত্যাবর্তন করেন। সেখানে দশম শ্রেণী পর্যন্ত পড়া চালিয়ে যান। প্রধান শিক্ষক কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিকের লেখা থেকে জানা যায় নজরুল অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। এ স্কুলেই কবি তার সহপাঠী ও বন্ধুরূপে কথা সাহিত্যিক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়কে পেয়েছিলেন। স্কুলে নজরুল ছিলেন

নামে, বিতর্কে, কবিতা লেখায় আবৃত্তিতে অন্যতম। লেটোর দলে থাকা অবস্থায়ই নজরুল ভালো হারমোনিয়াম বাজাতে পারতেন। বাঁশি বাজানোর ওস্তাদও ছিলেন। এই স্কুলের সঙ্গীত বিশারদ সতীশচন্দ্র নজরুলকে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে তালিম দেন। সুর তাল লয় সম্পর্কে তার কাছ থেকেই নজরুল বিশদ শিক্ষা গ্রহণ করেন। ছাত্রাবস্থায় রবীন্দ্রনাথের গান তিনি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গাইতেন।

১৯১৭ সালে সিয়ারশোল স্কুল থেকে পালিয়ে গিয়ে প্রথম মহাযুদ্ধে যোগ দেন। প্রিটেস্ট পরীক্ষা দিয়েই চলে গেলেন যুদ্ধে। ইংরেজদের সৈন্য দলে ৪৯ নং বাঙালি পল্টন নাম ধরে চলে গেলেন করাচিতে। সেখানে তার মেধা বলে কোয়ার্টার মাস্টার পদে হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলাম নাম ধারণ করেন। সেই সাথে প্রচুর লেখাপড়া করেন। কাজের ফাঁকে কলকাতা থেকে সব নামী পত্রিকা এনে পড়তেন। সৈনিকদের অরগান, ক্লারিওনেট, বেহালা, ব্যাঞ্জো সবরকম ঢোল জমা থাকত কোয়ার্টার মাস্টারের জিম্মায়। সেই ব্যারাকে একজন সুপন্ডিত সৈনিক পাঞ্জাবি মৌলানা সাহেবের কাছে নজরুল ফারসি শিখতে আরম্ভ করেন। এই সৈন্য ব্যারাকে থাকা অবস্থায় কবি 'রিক্তের বেদন' বইটি লিখেন। সেখান থেকে কবি মাঝে মাঝে তার রচিত গান-কবিতা লিখে কলকাতায় রঙিন মুসলিম সাহিত্য সমিতিতে পাঠাতেন। সেখান থেকে প্রকাশিত পত্রিকা কমরেড মুজাফ্ফর আহাম্মদের মাধ্যমে ছাপা হত। সেই সময় থেকে চিঠিপত্রের মাধ্যমে কবির সাথে তার নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। **১৯২০** সালে যুদ্ধ থেকে কলকাতায় চলে এলেন। এ সময় কবির কোন মাথা গোঁজার ঠাঁই না থাকায় উঠেন মুজাফফর সাহেবের বাসায়। সে সময় মুজাফফর আহাম্মদ সাহেব থাকতেন ৩২ নং কলেজ স্ট্রিটে। তারপর নজরুলকে নিয়ে মোজাফফর সাহেব চলে এলেন ৩/4 সি তালতলা লেনে। এখান থেকেই নজরুল তার বিখ্যাত কবিতা বিদ্রোহী রচনা করেন **১৯২১** সালের ডিসেম্বর মাসে। এই কবিতার মাধ্যমেই কবি বিদ্রোহী কবি নামে প্রতিষ্ঠা পান। বাংলা সাহিত্যে এক নতুন নক্ষত্রের উদয় হয়। বিজলী পত্রিকায় কবিতাটি প্রকাশিত হয়। কবিতাটি ইংরেজিতে ও জার্মানি ভাষায় অনূদিত হয়। তারপর থেকেই আরম্ভ হয় তার সাংবাদিক জীবনের। কবিতাটি রচনা করার পর নজরুল একদিন চলে যান তার গুরুদেবের কাছে। তিনি শান্তিনিকেতনে পৌঁছেই গুরুদেব গুরুদেব বলে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে চিৎকার করে ডাকতে থাকেন। রবীন্দ্রনাথ নজরুলকে অনেক স্নেহ করতেন। নজরুলের হাঁক ডাকে গুরুদেব বেরিয়ে এলেন। কবি তার ভরাট গলায় বিদ্রোহী কবিতা খানি আবৃত্তি করে শোনান। নজরুলের কণ্ঠে তার রচিত কবিতা শুনে রবীন্দ্রনাথ তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। **১৯২১** সালে জনৈক আলী আকবর খানের সঙ্গে নজরুল কুমিল্লায় যান। জনাব খান ছিলেন একজন লেখক ও প্রকাশক। **১৮** জুন তিনি খেয়ালের বশে **১৩২৮** বাংলা সৈয়দা খাতুনকে বিয়ে করেন। সৈয়দা খাতুনের নাম দিয়েছিলেন নজরুল 'নার্গিস'। খান পরিবারের সাথে বিরোধের ফলে নজরুল পরদিন ভোরে দৌলতপুর ত্যাগ করে চলে আসেন। **১৯২২** সালের সেপ্টেম্বর মাসে নজরুলের সম্পাদিত সাপ্তাহিক ধূমকেতু প্রকাশিত হয়। আনন্দময়ীর আগমনে কবিতা লিখে ২৩ নভেম্বর কুমিল্লায় নজরুল গ্রেফতার হন। তাকে **১৯২৩** সালে এক বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে ইংরেজ সরকার। ঐ বছরই ২২ ফেব্রুয়ারি রবীন্দ্রনাথ তাঁর গীতিনাট্য 'বসন্ত' নজরুলের নামে উৎসর্গ করেন। **১৯২৪** সালের **২৪**শে এপ্রিল নজরুল গিরিবালা দেবীর কন্যা প্রমীলা সেনগুপ্তের সাথে (ডাক নাম দোলন) বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেন। নজরুলের এই বিবাহকে অনেকেই মেনে নিতে পারেননি। ব্রাহ্মণ সমাজ ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়েও তিনি সস্ত্রীক হুগলীতে এসে বসবাস আরম্ভ করেন। **১৯২৬** সালের জানুয়ারি মাসে কৃষ্ণনগরে হিন্দু মুসলিম দাঙ্গার সময় তার বিখ্যাত সঙ্গীত 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার' রচনা করেন।

১৯২৯ সালের **১৫** ডিসেম্বর রবিবার জাতির পক্ষ থেকে এলবার্ট হলে নজরুলকে সংবর্ধনা দেয়া হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন বিজ্ঞানাচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। কবিকে মানপত্র দেয়া হয়। মানপত্র পড়েন বিখ্যাত সাহিত্যিক ওয়াজেদ আলী। বক্তাদের মধ্যে ছিলেন নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোস। মানপত্রের উত্তরে নজরুল বলেছিলেন, 'আমি এই দেশে এই সমাজে জন্মেছি বলেই শুধুমাত্র এই দেশেরই এবং এই সমাজেরই আমি নই। আমি সকল দেশের সকল মানুষের। সুন্দরের ধ্যান, তার স্তবগানই আমার উপাসনা, আমার ধর্ম। যে স্কুলে যে

সমাজে যে ধর্মে যে দেশেই জন্মগ্রহণ করি সে আমার দৈব। আমি তাকে ছাড়িয়ে উঠতে পেরেছি বলেই আমি কবি।

আমি শুধু সুন্দরের হাতে বীণা, পায়ে পদ্ম ফুলই দেখিনি। তার চোখে চোখ ভরা জলও দেখেছি। শ্মশানের কাছে, গোরস্থানের পথে, তাকে ক্ষুধা শীর্ণ মূর্তিতে ব্যাথিত পায়ে চলে যেতে দেখেছি। যুদ্ধ ভূমিতে তাকে দেখেছি, কারাগারে অন্ধ কূপে দেখেছি, ফাঁসির মঞ্চে তাকে দেখেছি।'

১৯৪২ সাল থেকে কবি অসুস্থ হয়ে পড়েন। কবি সাহিত্য ও সঙ্গীতে মাত্র বিশ একুশ বছর সাধনা করার সময় পেয়েছিলেন। এই অল্প সময়ে কবি নজরুল ধূমকেতুর মতো পৃথিবীতে এলেন আবার ধূমকেতুর মতোই চলে গেলেন। রেখে গেলেন অনন্য কবিত্ব শক্তি, বৈচিত্র্যময় সঙ্গীত জগৎ। বিস্ময়কর সৃজনশীলতা। সেই রবীন্দ্রযুগে নজরুলের আবির্ভাব গানকে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সমাহারে ভেঙ্গে সৃষ্টি করলেন 'নজরুল সঙ্গীত'। কম সহজ নয়। ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধুর ঐকান্তিক ইচ্ছায় কবিকে ঢাকায় এনে জাতীয় কবির মর্যাদা দেয়া হয়। ১৯৭৬ সালের ২৯শে আগস্ট শনিবার কবির প্রয়াণ ঘটে। তাকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদের পাশে সমাধিস্থ করা হয়।

হাসান ফেরদৌস

সতেরো নম্বরে বাংলাদেশ

১.

খবরটা ভাল না মন্দ ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।

সম্প্রতি ওয়াশিংটন-ভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান 'দি ফাণ্ড ফর পিস' নানারকম অংক কষে, নানারকম উপাত্ত ব্যবহার করে, 'ব্যর্থ রাষ্ট্র সমূহের একটি তালিকা' বা ইনডেক্স তৈরি করেছেন। মোট বারোটি সূচক বা ইন্ডিকেটর ব্যবহার করে পৃথিবীর ৬০-টি দেশকে তারা বিবেচনা করেছেন রাষ্ট্র হিসেবে তাদের সাফল্য বা ব্যর্থতা। তাদের ব্যবহৃত সূচকের মধ্যে জনসংখ্যার চাপ, মানবাধিকার পরিস্থিতি ও অসম অর্থনৈতিক অনুন্নয়ন যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে রাষ্ট্রক্ষমতার অবৈধতা (ডিলেজিটিমাইজেশন অব স্টেট), দ্বিধাবিভক্ত রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং নিরাপত্তা বাহিনীর ওপর সরকারী নিয়ন্ত্রণের অভাব। প্রতিটি সূচকের জন্য তারা রেখেছেন দশ নম্বর। সবচেয়ে বেশি নম্বর যে পাবে, বোঝা যাবে তার অবস্থা সবচেয়ে খারাপ। সবচেয়ে কম নম্বর যে যাবে, তার অবস্থা সবচেয়ে ভাল।

এই ৬০-টি দেশের সবাই যে ব্যর্থ তা নয়। প্রাপ্ত নম্বর থেকে এমন একটি সিদ্ধান্ত করা যায় যে প্রথম দিকের ১০-টি দেশ হয় পুরোপুরি, নয়তো বহুলাংশে ব্যর্থ। পরের ১০-টি দেশও নানাভাবে দূর্বল, তারা এখনো ঠিক ব্যর্থ রাষ্ট্র হয়ে ওঠেনি, কিন্তু ব্যর্থতার লক্ষণ গুলো ক্রমশ: স্পষ্ট হয়ে উঠছে। তারো পরের ১০-টি দেশের অবস্থা আরেকটু ভাল, তবে কিছু কিছু দুর্বলতার লক্ষণ তাদেরও রয়েছে।

এই ইনডেক্সের এক নম্বর রয়েছে আইভরি কোস্ট, আর তিরিশ নম্বরে ইথিওপিয়া। বাংলাদেশ আছে মাঝামাঝি স্থানে, সতেরো নম্বরে। এই ক্রমিক নম্বর দেখে বাংলাদেশ নিয়ে এখনি অস্থির হবার কিছু হয়তো নেই, কিন্তু সূচক-প্রতি যে নম্বর সে পেয়েছে, তা থেকে বোঝা যায় দেশটির বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান দূর্বল হয়ে আসছে। এখনি যদি ব্যবস্থা না নেওয়া হয়, তাহলে আইভরি কোস্ট হওয়া তেমন দুরন্ত নয়। মোট নম্বরের হিসেবে এই ইনডেক্সে আইভরিকোস্ট পেয়েছে ১০৬, আর বাংলাদেশ ৯৪.৭, অর্থাৎ দুই দেশের মধ্যে ফারাক মোট ১১ নম্বর। ভয়টা সেখানেই। গৃহযুদ্ধ-বিধ্বস্ত আইভরিকোস্ট এখন কার্যত: একটি ব্যর্থ রাষ্ট্র। সেখানে শান্তি বজায় রাখার জন্যে জাতিসংঘ থেকে শান্তিরক্ষা বাহিনী পাঠানো হয়েছে, কিন্তু শান্তি রক্ষিত হচ্ছে, সে কথা বলা যাবে না। দেশের দক্ষিণে একটি সরকার রয়েছে বটে, কিন্তু দেশের উত্তরে, সেখানে একটি বিদ্রোহী বাহিনী বছর দুয়েক ধরে ক্ষমতা আগলে আছে, কেন্দ্রীয় সরকারের কোন কোন প্রভাবই সেখানে নেই। তার তুলনায় বাংলাদেশ অনেক ভাল অবস্থায় রয়েছে। পুরো দেশের ওপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ রয়েছে, দেশের সীমান্ত এলাকাও তারাই নিয়ন্ত্রণ করছে। কিন্তু তারপরেও আইভরিকোস্টের তুলনায় বাংলাদেশের অবস্থা মোটেই ভাল না, বিশেষ করে দীর্ঘমেয়াদি হিসেবটা যদি মাথায় রাখি। ব্যর্থ রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অবস্থান ১৭ হলেও ব্যর্থতা নির্ণয়ে যে ১২-টি সূচক এখানে ব্যবহার করা হয়েছে, তার প্রায় প্রত্যেকটিতেই সঙ্কটের চিহ্ন বর্তমান। বাংলাদেশে জনসংখ্যার চাপ বাড়ছে, ঘরছাড়া মানুষের সংখ্যা বাড়ছে, অসন্তোষ বাড়ছে, অর্থনীতির অবনমন ঘটছে, মানবাধিকার পরিস্থিতি খারাপ হয়ে আসছে, রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে কোন্দল বাড়ছে, সবচেয়ে বড় কথা রাষ্ট্রযন্ত্রের বৈধতা হ্রাস পাচ্ছে। সব মিলিয়ে উদ্বেগজনক একটা চিত্র।
'আরে দুর দুর, এসব পশ্চিমা ষড়যন্ত্র' বলে এক কথায় নাকচ করার আগে একটু মাথা ঠাণ্ডা করে ভাবা যাক আসলে এরা কি বলতে চাইছে। এই ইনডেক্স থেকে আমাদের কিছু শেখার আছে কিনা, তাও ভেবে দেখা দরকার।
গোড়াতেই এই ইনডেক্স তৈরির প্রেক্ষিতটি মনে রাখা দরকার। ৯/১১ -এর সন্ত্রাসী হামলার পর থেকেই মার্কিন নীতি-নির্ধারক মহলে পৃথিবীর ব্যর্থরাষ্ট্র বা সম্ভাব্য ব্যর্থরাষ্ট্র সমূহ নিয়ে ভাবনা চিন্তা শুরু হয়েছে। যে দেশ রাষ্ট্র হিসেবে যত ব্যর্থ, আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার জন্যে সে ততো বেশী মাথা ব্যথার কারণ। নিজের দেশের মানুষদের জন্যে তো বটেই, তার প্রতিবেশি দেশসমূহ, এমনকি অনেক দূরের কোন কোন দেশও তাদের ব্যর্থতার জন্যে হুমকির সম্মুখিন হতে পারে। সে অবস্থা যাতে না হয়, সে জন্যে ব্যবস্থা আগেভাগেই নিতে হবে, দরকার হলে সামরিক ভাবে তার মোকাবেলা করতে হবে। সমস্যা গণগনে আগুন হয়ে ছড়িয়ে পড়ার আগেই যদি সামাল দেওয়া যায় তাহলে ইরাক বা আফগানিস্তানের মত 'মোট খর্চা'–র সম্মুখিন হতে হয় না। 'ব্যর্থ রাষ্ট্র' নিয়ে ভাবনা-চিন্তা সে কারণেই। ২০০২ সালে আমেরিকা যে জাতীয় নিরাপত্তা স্ট্র্যাটেজি প্রকাশ করে, তার মোদ্দাকথাই ছিল, শক্তিশালী দেশের চেয়ে বরং দূর্বল দেশ, যারা রাষ্ট্র হিসেবে ব্যর্থ হচ্ছে, তাদের কাছ থেকেই আমেরিকার নিরাপত্তার ওপর হুমকি আসছে বেশি। প্রেসিডেন্ট বুশ সে রণকৌশলের মুখবন্ধে কথাটা আরো খোলাসা করে বলেছিলেন যে, দারিদ্রের কারণে কোন দেশের মানুষ সন্ত্রাসীতে পরিণত হয় না, কিন্তু দারিদ্র, দুর্বল (রাষ্ট্রীয়) প্রতিষ্ঠান এবং দুর্নীতির কারণে রাষ্ট্র দূর্বল হয়ে পড়তে পারে, আর তার ফলে সন্ত্রাসীরা বা মাদক ব্যবসায়ীরা সেখানে আস্তানা গাড়তে পারে। উদারহণ হিসেবে বুশ আফগানিস্তানের কথা বলেছিলেন।

এই ইনডেক্সটি যারা তৈরি করেছেন তারা বাহ্যত মার্কিন প্রশাসনের কেউ নন, তবে এই মার্কিন চিন্তাভাবনার সাথে খুব ঘনিষ্ঠভাবেই পরিচিত। তাদের ধারণা, এই তালিকা এক ধরনের আগাম পূর্বাভাসের কাজ করবে, কোথায় আশু ব্যবস্থা নেওয়া দরকার, সে ব্যাপারে মার্কিন প্রশাসনকে সচেতন করে দেবে। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, দূর্বল দেশগুলো নিজেরাই তাদের সম্ভাব্য পতন ঠেকাতে সচেতন হবে এবং সে ব্যাপারে ব্যবস্থা নেবে। আর কিছু না হোক, এ নিয়ে সে সব দেশে তর্ক-বিতর্ক হবে, পিস ফান্ড তাই আশা করে। অনেকটা

জাতিসংঘের মানব উন্নয়ন ইনডেক্সের মত, সেখানে অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রশ্নে কোন কোন দেশ কতটা এগিয়ে, তার একটা তালিকা পাওয়া যায়।

ব্যর্থ রাষ্ট্র নিয়ে যে এক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উদ্বিগ্ন তা নয়। বহুজাতিক সংস্থাগুলোও এ নিয়ে ভাবছে, রাষ্ট্রযন্ত্রের ব্যর্থতা ঠেকাতে আগেভাগে কি করা যায়, তা নিয়ে আলাপ-আলোচনাও শুরু করেছে। নিজ দেশের নাগরিকদের রক্ষণাবেক্ষনের দায়িত্ব সে দেশের সরকারের। সে কাজে তারা ব্যর্থ হলে আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপ শুধু বৈধই নয়, তা বাঞ্ছনীয়, এমন একটি নতুন নর্ম নিয়েও নানা মহলে আলাপ-আলোচনা শুরু হয়েছে।

আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার জন্যে ব্যর্থ রাষ্ট্রের সমস্যা কতোটা গুরুত্বপূর্ণ সে কথা বোঝানোর জন্যে ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইসিস গ্রুপ সম্প্রতি একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর 'কনফ্লিক্ট রিস্ক এলার্ট' পাঠানো শুরু করেছে। সেপ্টেম্বর ২০০৫-এ যে এল্যার্ট তারা পাঠিয়েছে, তাতে সবার ওপরে রয়েছে আফগানিস্তান ও ইরাক। সাথে 'অবনমিত পরিস্থিতি' এই শিরোনামে ১১-টি দেশের তালিকা দেওয়া হয়েছে, তার এক নম্বরে রয়েছে বাংলাদেশ।

বাংলাদেশকে নিয়ে বিদেশে কোথাও কোন কিছু লেখার সমস্যা হল, মন্দ কথা বলা হলে অমনি তাতে আমরা ষড়যন্ত্রের গন্ধ পাই। কিন্তু ভাল বললে তা বিনা বাক্যে মেনে নেই। ২০০৫ সালের মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনে বাংলাদেশ নিয়ে বেশ কিছু ভাল কথা আছে, আশান্বিত হবার মতা কথা আছে। ফলে দেশের পত্র-পত্রিকায় তো বটেই, দেশের নেতা-নেত্রীরাও সে রিপোর্ট থেকে অহরহ উদ্ধৃতি দিচ্ছেন। ব্যর্থ রাষ্ট্রের এই ইনডেক্স থেকে তারা ভাল কিছু দেখবেন বলে মনে হয় না, ফলে এর ভাগ্যে কি রয়েছে, তা বোঝা খুব কষ্টকর নয়।

আমি নিজে এতে ষড়যন্ত্র দেখি না। এটি নেহায়েতই একটি ইন্টেলেকচুয়াল একসারসাইজ, যার ভিত্তিতে রয়েছে পূর্বনির্ধারিত কতিপয় বৈজ্ঞানিক নীতিমালা। বারোটি সূচক তারা আগেভাগে নির্ধারণ করে নিয়েছেন, সে সূচক কিভাবে মাপা হবে তারও একটি ফর্মুলা তারা ঠিক করে নিয়েছেন। এই ফমুর্লার ভিত্তিতে ২০০৪ সালের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে তারা উপাত্ত সংগ্রহ করেছেন। সে সব উপাত্ত প্রসেস করার জন্য একটি বিশেষ সফটওয়্যার তারা তৈরি করেছেন, যা ব্যবহৃত হয়েছে সমীক্ষায় অন্তর্ভূক্ত প্রতিটি দেশের বেলায়। সে সব সূচক নিয়ে বা ব্যবহৃত উপাত্ত নিয়ে আমাদের আপত্তি থাকতে পারে, কিন্তু বাংলাদেশকে বা আইভরি কোস্টকে - বিশেষভাবে হেয় করার জন্যেই 'সিলেক্টিভলি' উপাত্তের ব্যবহার হয়েছে, আমার তা মনে হয় না।

রাষ্ট্র মানে আসলে সে রাষ্ট্রের অন্তর্গত প্রতিষ্ঠান সমূহ। সরকার, নিরাপত্তা ব্যবস্থা, আইন ও বিচার ব্যবস্থা, তথ্যমাধ্যম ইত্যাদি নিয়েই একটি রাষ্ট্র। কোন রাষ্ট্র রাতারাতি ব্যর্থ হয় না, কিন্তু ধীরে ধীরে তার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান দূর্বল হয়ে উঠতে পারে। এই সব প্রতিষ্ঠান যত দূর্বল হয়, রাষ্ট্রও তত দূর্বল হয়ে আসে। রাষ্ট্রীয় ব্যর্থতার সবচেয়ে বড় সিম্পটম নিজের জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকারী ব্যর্থতা। এই ভাবে কোন রাষ্ট্রে তার সরকার যখন দেশের সকল জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করার বদলে কোন বিশেষ দল, গোত্র বা ধর্মের অনুসারীদের পক্ষাবলম্বন করে, খাদ্য, স্বাস্থ্য ও শিক্ষাসহ অধিকাংশ জনকল্যাণকর সার্ভিস প্রদানে অপারগ বা অক্ষম হয়ে পড়ে, তখন সে দেশের রাষ্ট্রযন্ত্রের ব্যর্থতা ধরা পড়ে। দুর্নীতি, তা আইন প্রয়োগ বা বিচার ব্যবস্থা যে ক্ষেত্রেই হোক না কেন, সরকার (এবং ফলত রাষ্ট্রের) ব্যর্থতার আরেকটি লক্ষণ। রাষ্ট্রের ভেতর কার্যকর ক্ষমতা সরকারের হাতে কেন্দ্রীয়ভাবে থাকার বদলে তা যখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 'ওয়ার লর্ড'–দের হাতে বিভক্ত হয়ে পড়ে, তখন বোঝা যায় সে দেশ রাষ্ট্র হিসেবে তলিতে এসে ঠেকেছে। রাষ্ট্র তথা রাষ্ট্রযন্ত্রের অন্তর্গত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের 'ডিলেজিটিমাইজেশন' ঘটে তখনি। দেশের মানুষ সে দেশের সরকারকে আর বিশ্বাস করে না,

তাদের মনে এই আস্থা আর থাকে না যে এর পক্ষে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব, এর হাতে সুবিচার পাওয়া সম্ভব। ঠিক যেমন হয়েছিল আফগানিস্তান এবং সিয়েরালিওনে। আজকের সোমালিয়া ঠিক সে কারণেই এখনো একটি ব্যর্থরাষ্ট্র বলেই পরিচিত।

ঝড় আসার আগে বিপদ সংকেত দেওয়া হয় যাতে বিপদসংকুল মানুষ নিরাপদ স্থানে যেয়ে আশ্রয় নিতে পারে। এমন অনেকে আছে যারা সে সংকেত শুনেও নিজেদের ভিটে-মাটি আগলে বসে থাকে এই আশায় যে, ঝড় বোধহয় তাদের এলাকা স্পর্শ করবে না। বাংলাদেশে এমন লোকের অভাব নেই। ইসলামী সন্ত্রাসীদের নিয়ে তিন বছর আগে থেকে বিদেশী পত্র-পত্রিকায় আমাদের সাবধান করে লেখা শুরু হয়েছে। আমাদের সরকার তো বটেই, নিজেদের খুব চালাক মনে করেন এমন একদল কলমবাজ বুদ্ধিজীবীও ব্যাপারটাকে বিদেশীদের চক্রান্ত বলে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়েছেন। এখন সেই সন্ত্রাসীরা বুকের ওপর চড়ে বসা বাকি রেখেছে।

পিস ফাণ্ড তাদের এই ব্যর্থ রাষ্ট্রের ইনডেক্সের মাধ্যমে আরেকবার বিপদ ঘন্টা বাজিয়ে গেল। আইভরিকোস্ট থেকে ইথিওপিয়া, সে ঘন্টার আওয়াজ সব দেশেই পৌঁছে গেছে। এখন সে ঘন্টা শুনে ঘর সামলাবার আয়োজন করবো কি করবো না, তার দায়িত্ব শুধু আমাদের, অন্য কারো নয়।

পুনরায় কোনো এক নক্ষত্র

হাসান আল আব্দুল্লাহ

(2q m‡Mi †kl Ask)

ক

আধময়লা চাঁদটা বহুদিন দেয়না প্রয়োজনীয় আলো। কখনো বা মেঘে
ঢাকা, কখনো বা খোলা আকাশের অক্সিজেনহীন বিমূর্ত প্রাঙ্গণে।

কামহীন অলস বালক–হাই তুলে, শূন্যে দৃষ্টি ঝেড়ে, আবার ঘুমিয়ে

পড়ে কী এক ভাবালুতায়। কখনো বা চোখ খোলে, কুকুরের সঙ্গম ও মানুষের বিবর্ণ উল্লাসে হতচকিয়ে আবার
পাড়ি দেয় ঘুমের দ্রাঘিমা।
ইদানীং মুখখানা অন্যদিকে ঘুরিয়ে নেবার জন্যে বড়ো ব্যস্ত হয়ে থাকে।

খ

কোনো কোনো শ্রাবণের রাতে ঝুলি, ঝাঁপি, পোলো, জাল, তলপি–
তলপাসহ নেমে পড়ে বিলে। পথে যেতে যেতে দেখে নেয় সম্ভ্রান্ত গাভীর

সোনালি ওলান। শালিখ, বৃশ্চিক আর মোরগের যৌনক্রিয়া। তারপর

মাছ ধরে–সাঁতরায় ঢলের পানিতে–ময়লা গতর আরো কাদাময়
করে উঠে আসে আমাদের প্রিয় লোকালয়ে। আজকাল চাঁদের নরম
আলো এতটুকু কখনো যায় না পাওয়া এমনকি নিয়মতান্ত্রিক

বৈধ যৌনতার প্রয়োজনে। অন্ধকারের মাতাল দেহ খুশি হয়,

চাঁদ আর আমারে এইসব ছাড়াছাড়ি দেখে। খুশি হয় শেয়ালের
দল। সহজ সঙ্গমে সমর্পিত হয় ছোটো বড়ো কুকুরের ঝাঁক।

৪২

ক

ক্লান্ত শরীর আমার, চুয়ে পড়ে ঘুম। ট্রেনের দুলুনি ছন্দহীন।

কাত হয়ে ঘুমিয়ে ছিলাম কর্কশ জীবনে গোবেচারা সৌন্দর্য চয়নে।
সাম্রাজ্যের এই পারে এইসব কষ্টমাখা দিন কখনো দেখেনি ওরা–

অথচ চিন্তায়, অথবা অসুস্থ অবসরে, হয়তো সুস্থও, অদেখা বেহেশত
বিশ্বাসের মতোই বিশ্বাস করে এর যথার্থ মহাত্ম । আমিও যাইনি কম–
অলিগলি, নাড়িনক্ষত্র ঘুরে ট্রেনের ভেতরে বসে স্তন চুষি অনন্ত ঘুমের ।

খ
অন্ধকারে একটানা ঝিঁঝির ডাকের মতো শব্দ কাতরায় । কালো
সুড়ঙ্গের দেহে হেড লাইটের ক্ষীণ আলো পড়তেই জ্বরতপ্ত নারীর মতন

কেঁপে ওঠে সামনের পথ; তার মাঝে সাপের মতন এঁকেবেঁকে, কখনো বা

হুইসেলের দীঘল জিহ্বা টেনে নির্দিষ্ট গতিতে চলে আমাদের ট্রেন ।
কবিতার খাতা খুলি, অথবা গল্পের বই, উপন্যাস, কিম্বা প্রবন্ধও বাদ
যায় না তালিকা থেকে । চলে মনের ঘুপচিগলি : মেক্সিকো সিটির

খাবার পানিতে বিষ, ইস্তাম্বুলে হুড়মুড় বেড়ে যাওয়া লোক, চীনের নিজস্ব

দাঁত ঘষে চলার সাহস, বাংলাদেশের নৈতিকতাহীন কবন্ধ রাজনীতিক ।
কচ্ছপের মতো প্রথমে স্টেশন, চোখ খুলে তারপর লাফ দিয়ে নামি ।

৪৩
ক
সাদা বরফের কারুকাজে আলোকিত রাতের বিদেশ; পায়ে পায়ে

উঠে এসে চোখ রাখি জানালায়–গাড়ি চলা প্রশস্ত রাস্তায়,
পায়ে হাঁটা পথ আর সম্ভ্রান্ত পার্কের মাঝদিয়ে এঁকেবেঁকে উঠে যাওয়া

কংক্রিট চাতালে । বরফের জানুয়ারি আমাকেও ডাকে । যে শরীর
জনপদে বিছিয়েছে উলঙ্গ নারীর মতো, ফুটন্ত ফুলের মতো–
তার আহ্বানে আমিও তড়িঘড়ি উঠে আসি সজ্জিত পোশাকে ।

খ
সাদা শাড়ি পরা লম্বা গাছের বাকলে তর্জনির ডগা দিয়ে মাঝরাতে
আমিও 'কবিতা' লিখি । বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে, দেয়ালের ধার ঘেঁষে

অথবা আমার জানালার কার্নিশে তুলোর মতো, অথচ চাদর

যেনো অনন্ত সফেদ–আস্তে আস্তে লিখে রাখি 'এইসব বিমূর্ত কবিতা,'
স্বভাবতই আলোকোজ্জ্বল, দূর থেকে দেখা যায় সুন্দরের
সুবর্ণ প্রতিমা । মাঝরাতে এইসব তুষার চাদরে পুলক বিহ্বল

এক বাঙালি যুবক একে একে রেখে যায় পায়ের সুস্পষ্ট ছাপ–কিছুদূর

যেতে না যেতেই যারা আবার মিলিয়ে যায় সহজ নিয়মে। মহাকালে
যেমন অদৃশ্য হয় লক্ষকোটি কবির কবিতা–ভাব ভাষা, সম্ভাবনা একদার।

৪৪

ক

মৃত মানুষেরা সারিবদ্ধ আমাদের দিকে ছুটে আসে; আমরাও পায়ে পায়ে

ছুটি। আলিঙ্গন করি তাদের, যেমন ঈদের নামাজ শেষে একে অন্যকে সর্বদা।
মৃত আর জীবিতের মাঝে কোনোই পার্থক্য নেই, একথা আমরা বুঝে গেছি।

ওদের সুদৃঢ় আলিঙ্গন তাই আমাদের উষ্ণ করে তোলে। আমরা বুঝতে পারি
পৃথিবীর যাবতীয় পাপ ও পূণ্যের ওরাও সমান অংশীদার–প্রতিটি হত্যার
জন্যে ওরাও সমান দায়ী–প্রতিটি ধর্ষণ, অন্যায়, সন্ত্রাস ও কুকর্মের জন্যেও।

খ

আঘাতের পর যেসব আঘাত আসে আমাদের গায়ে, রক্তে ঢোকে বল্লমের
পর ধারালো বল্লম, চোখে লাগে তেজস্ক্রিয় রাসায়নিক জহর, পায়ে পায়ে

ঢেলা–যতো হাঁটি ততো বাড়ে দুর্ভিক্ষের পথ–এর জন্যে মৃতেরাই দায়ী

বেশি জীবিতের থেকে। পৃথিবীর বেশ্যাপল্লিগুলো আজ মৃতদের পরিপূর্ণ
দখলে রয়েছে। ওরাই অত্যাচারের নিয়মাবলি বানিয়েছে পরিকল্পিত দক্ষতায়–
শোষণের যন্ত্রপাতি। বাঘিনির মতো ওঁৎ পেতে বসে থাকা ওরাই তো

শিখিয়েছে আমাদের। আমরা এখন তাই ওদের হাতের সুবর্ণ পুতুল।

অনুসরণ করছি ওদেরই পদরেখা। আর মাঝে মাঝে, প্রয়োজনে,
কখনো বা শুধুই নিজেদের ইচ্ছা মতো, খুঁড়ে যাচ্ছি অসংখ্য কবর।

৪৫

ক

এইসব ঠিকঠাক আয়ত্ত্বে এসেছে; তোমরা প্রাধান্য রেখে কথা বলো।

মনে হয় দুর্ঘটনা, তথাপি এটাই তোমাদের একান্ত স্বভাব–নিজেদের তুলে ধরা।
আর তাই দু'পা দুলাতে দুলাতে নিপুণ কৌশলে অন্যায়কে সুন্দর গুছিয়ে ন্যায়ের বাটিতে

তোমরা যখন খুলে ধরো, মন দিয়ে শুনি, এবং দেখতে পাই তোমাদের মুখগুলো
ইলিয়াস বর্ণিত অসংখ্য ছোটো ছোটো লেজ হয়ে টেবিলের অন্যসব মুখে দোল

খায়। খুশিতে উনুনে ফুটন্ত পানির মতো টগবগ করো–বসন্তের কুকুরের মতো।

খ

এগারো তলার ইলেভেটর ধরতে আমাকে উঠতে হয় তড়িঘড়ি; শহরের
সুশিক্ষিত তরুণ নাবিক, আর মেধা মজ্জার দুরন্ত সেনাদের পাশ

কাটিয়ে কে কত আগে যেতে পারে আমি সানন্দে দেখব সেই খেলা।

তারপর একসময় ইলেভেটর পদপ্রান্তে অনেকেই তীর্থের কাকের মতো;
পাহাড়ের পাদদেশে যেমন একদা আমাদের পূর্বপুরুষেরা সমবেত হতেন বিশেষ
প্রয়োজনে। দেখব হুল্লোড়–ঢেলাঢেলি; হয়তো সিঁটকে যেতে পারি।

অথবা চাপের মুখে পড়ে স্রোতের ভীষণ টানে দাঁড়াতেও পারি সকলের মাঝে।

তারপর এর গায়ের দুর্গন্ধ ওর নাকে, ওর মোজার খুশবু এর গায়ে। উজানের
দুরন্ত পুঁটির মতো হয়তো। এভাবে পৌঁছে যেতে পারি আমার গন্তব্যে শেষমেষ।

৪৬

ক

তখন গভীর রাত। চারিদিকে শীতের প্রতাপ। বরফের ভাঁজে ঢাকা

এই নগরীতে ঠাণ্ডা বাতাসের সাথে যুদ্ধ করতে করতে হাঁটি।
ল্যাম্পোস্টের আলো আমাকে জমাট বরফের মাঝ দিয়ে পায়ে চলা পথ

দেখিয়ে অনেক দূর নিয়ে যেতে পারে। আপাদমস্তক ঘিরে আমি
শীতের শরীর উপভোগ করি–স্তুপিকৃত বরফের ঘ্রাণ। কখনো বা সেই টানে,
আবার কখনো সংসারের একান্ত দায়িত্ব পালনের সদিচ্ছায় মাঝরাতে বের হই।

খ

অনন্ত জমাট বরফের স্তর থেকে সকৌতুকে হাতে তুলে নেই একখণ্ড বিবস্ত্র শরীর।
তারপর ল্যাম্পোস্টের আলোতে পরীক্ষা করি–উলটিয়ে পালটিয়ে দেখি।

দেখি তার ভেতর বাহির–ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমাট কণারা নিবিড় হয়েছে আরো।

মনে হয় হীরকের খণ্ড। মনে হয় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ উপহার। মনে হয়
প্রিয়ার শরীর। তাকে নিয়ে খেলা করি। শূন্যে ছুঁড়ে আবার সযত্নে

ধরি । রাস্তার উপরে রেখে দেখি; দেখি ফের হাতের তালুতে ।

অবশেষে খেলা করে আমারই সাথে এই রাতের বরফ । বিলি কাটে চুলে ।

হেঁটে যায় হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে । সেইখানে শুয়ে করে উচ্চারণ;
ভালবেসে শেষ হয়ে যেতে যেতে হয়তো । পেতেও পারি সুখের আকর ।

৪৭

ক

ক্লেদাক্ত এ পৃথিবীর কদর্য কলুষ কিছু কর্কশ কবিতা নিয়ে আর কত কাল

এভাবে কাটাব । আর কত কাল তুমি বলবে, ওসব প্রেমের কথা এখন ছেঁড়ে ছুঁড়ে
ভালো মানুষের নির্ভেজাল কাতারে উঠে এস; ভণ্ডামির সময় এখন শেষ ।

কবিতার দেহ নিয়ে দিনরাত কাকের অসামাজিক শব্দমালা তোমাদের শরীরের
বিষজ্বালা শুধুই বাড়ায়; অতএব ক্রমাগত উত্থানের দিকে হাঁটায় ইচ্ছায়
তোমাদের আদ্যান্ত জীবন–সমস্যারই স্বগত আক্রমণ বই অন্যকিছু নয় ।

খ

সংক্ষিপ্ত সুবর্ণ সময়ের সম্ভাবনার ধার ঘেঁষে আবার তোমার জন্ম । আবার তুমিও
হাতে তুলে নিতে পার পরাবাস্তবতার দেউল, লেংটি কুকুরের মতো তুমিও এখন

ছুটে যেতে পারো যেদিকে আঁধার । হয়তো আবার ঘুরেও আসতে পারো আলোকের

দিকে । কিছুই এখন অসম্ভব নয়–রক্তে যখন পৃথিবী পুরোপুরি ভেসে বেড়ায় তখন
সম্ভাবনার দরজা চারদিক থেকে খিল আঁটা, স্বাভাবিক নিয়মেই । মানুষের
সমাজে যখন আর মানুষের প্রয়োজন নেই, সন্ত্রাস ও হামলার গিঁট খুলে যাবে

দুড়দাড়, যেমন একদা খুলেছিল পুবাকাশে সূর্যের আদল । নিভে গেছে । আস্তে আস্তে

আমরা সবাই ঢুকে যাচ্ছি প্রাচীরিত যন্ত্রণার দ্বারান্তে দুর্মর পড়ে থাকা রোগজীবাণুর
মাঝে । অতএব আমাদের যন্ত্রণার অন্ধকার সময়ে তুমিই একমাত্র ভরসা–সন্ত্রাস ।

৪৮

ক

পাথর নক্ষত্র থেকে আসে অনেক সভ্যতা । নিভে যায়, আবার দু'পায়ে ভর দিয়ে

দাঁড়ায় কখনো । সমুদ্রে বিলীন, আগ্নেয়গিরির ভয়ার্ত লাভায় পুড়ে নষ্ট

হয়ে যায় আমাদের সভ্যতার অবশিষ্ট সমবায় । নষ্ট হয় হতাশা, আক্রোশ

আর অস্তিত্বের তুমুল খেলায় । তীর ধনুক বল্লম থেকে শুরু হয়, আরও আগে
কাকের মতন ঠোকাঠুকি– আস্তে আস্তে উঠে আসে আগ্নেয় অস্ত্রাদি । আস্তে আস্তে
জন্ম হয় পরমাণু ভেঙে তুলে আনা বিপুল শক্তির চাল । পাথর নক্ষত্র থেকে...

খ

ধবংস স্তুপের ওপর গড়ে ওঠে জীবনের এমত বিপুল আয়োজন । টুরিস্টের ঘোরাফেরা...
কেউ কেউ স্থানীয় হলেও টুরিস্টের সংখ্যাই অধিক আমাদের জনপদে ।

আর নির্দেশ ও বিদ্বেষের অতন্দ্র প্রভাব । আমরা নিয়ম আর অনিয়মের

মাঝে ভেঙে ভেঙে জেগে থাকি । মাঝ রাতে ফোনের শব্দেও আচমকা
ঘুম ভেঙে যায়... ভেঙে যায় আমাদের নিমগ্ন চিন্তার শিরাউপশিরা । আর
দুর্দশাগ্রস্ত সময় চারদিক থেকে আমাদের পুরোপুরি ঘিরে ধরে ।

তারপর বাতাসের পাখায় বিদ্যুৎ রেখে নাচায় সমস্ত সংগ্রামী অস্তিত্ব ।

আদতে যদিও তাকে কোনো অস্তিত্বই বলা যায় না । যদিও ছোটো ছোটো
জীব, নিম্নশ্রেণীর পতঙ্গ, কিটের মতন আমাদের নিয়মিত বসবাস...

৪৯

ক

আমরা অন্তত আপাত শান্তির তাড়নায় নিজেদের মহৎ, মহান মনে করি ।
মনে করি, আমরাই অধিকর্তা– কাছাকাছি না গেলেও কেউ কেউ স্বঘোষিত

সরব অধিনায়ক হয়ে যাই অনায়াসে...চলি, সাথে সাথে চালানোর জন্যে

ব্যস্ত হয়ে উঠি । দুঃস্বপ্নের অতি কাছে পৌঁছেও আমরা তাকে পূর্ণতায় স্বপ্ন আর
মনের গভীরে পুঁষে রাখা নিয়ত আকাঙ্ক্ষা ধরে নিয়ে ছুটি... ছোটাই এবং
আশেপাশে যা আছে আঘাত করি তাকেই সজোরে । কখনো উদ্দিষ্ট ভেঙে পড়ে,

কখনো বা আমাদের হাত ফেটে তিরতির ছোটে রক্তের প্রশস্ত রাস্তা... কখনো আবার

দুমড়েমুচড়ে পড়ে থাকি... তথাপি আমরা ভেঙে পড়ি না, আবার শুরু হয়
আমাদের কর্কশ কলুষ জীবনের অনন্ত চাওয়ার বাস্তবায়নের নিয়মিত সুবেশ মহড়া ।

খ

আমরা আদতে পাথরও নই, কিন্তু আমরাই নিয়মের নির্মম পাথর। আমরা আদতে

নক্ষত্রের ধারে কাছে ঘেঁষতেও সাহস সঞ্চয় করতে পারিনি, কিন্তু আমরা সতত
ভান করি, আমরাই প্রতিটি উদিত নক্ষত্রের দীপ্যমান আলো। বস্তুত সময়

ও সময়হীনতার মাঝে হাবুডুবু খেতে খেতে, নিয়ম ও নিয়তির কাছে প্রতিনিয়ত আঘাত
খেতে খেতে নিজেদের পূর্ণ অবস্থানের কথাও ভুলে গেছি... ভুলে যাই যখন তখন।
অতএব আমরা বোকার মতো মেনে নিয়েছি যে আমরাই শ্রেষ্ঠ... শ্রেষ্ঠত্বের অধিকর্তা।

৫০

ক

সমসাময়িক অনেক কিছুই ভালো লাগার ভেতরে না পড়লেও আমরা একে অন্যকে স্পষ্টত

জানিয়ে দিতেও প্রস্তুত, আমরা ভালোবাসি। মিশে থাকে খাদ, গরল, অহঙ্কারের উচ্চারণ।
ভালোবাসাবাসির মতন একটি আবহ সৃষ্টি করি নিজেদের প্রয়োজনে। আবার সময়ে

যুদ্ধে নেমে যাই। মনোনীত নীতির বাইরে আমরা কিছুই সত্য বলেও মানি না।
নির্মমতার সমস্ত উপকরণ নিয়েই ঝাঁপ দিই নিমেষে ধুলায় মিলিয়ে দেবার
বাসনায়–আমাদের যা কিছু অর্জন। ভাবি, তথাপিও আমরাই শ্রেষ্ঠ।

খ

পলাতক সত্যের দু'হাতে তুলে দেয়া সৌভাগ্যের মাছ, হাঁটুজলে নেমে
ধরেছিল নক্ষত্র পাথর, আস্তে আস্তে ম্রিয়মাণ হতে হতে হাওয়ায় মিলিয়ে যায়–

যেমন মুহূর্তে মার্কেজের পার্শ্ব নায়িকারা, শত বছরের অন্ধকার ছেড়ে

উঠে যায় সুদূর আকাশে। মৃত্যুপুরীর ভয়াবহতা মিথ্যে হয়ে যায় ইতিহাসের নির্মম
পাতা থেকে–পুরোপুরি উড়ে যায় এমনকি মানুষের স্মৃতিবিস্মৃতির ঘনায়মান যন্ত্রণা
আর প্রতিদিনের অমানুষিক জীবনের অনিয়মতান্ত্রিক, যদিও আরোপিত, ধারাবাহিকতা

থেকে। আটলান্টিকের তলদেশে ডুবে যাওয়া সভ্যতা যেমন, বিন্দু বিসর্গ চিহ্নের আঁচ

না রেখেই চির দিনের বিদায়, বিদায়, বিদায় বলতে বলতে চলে যায়... উত্থানপতন
জানিনা আমরা, জানবও না কখনো; জানি, শুধু ছিল, এখন কোথাও নেই।

৫১

ক

ঘটে যাওয়া নির্মমতার সুস্পষ্ট সাক্ষী পাথর, নক্ষত্র–এবং আমিও; বর্ণিত সমগ্র মিথ্যা

এবং যাকিছু সত্য দাবি করা হয় । আমাদের সন্তানদের জন্যেও রেখে যাওয়া
ওরাই আপাত ইতিহাস... পথের সামনে দাঁড়িয়ে ওরাই আঙুল উঁচিয়ে বলে, এই দিকে ।

পাথর নক্ষত্র হাঁটে, আমরাও হাঁটি... আমাদের সন্তানেরা নিয়মিত অনুসরণ করার পর
হয়তো তারাও মাঝেমধ্যে ইতিহাস হয়ে যায়... কেউ কেউ ফিরে দাঁড়ালেও সময় ও
সম্পর্কের কথা বলে আমরাই হাত ধরাধরি করে ইতিহাসের দরজা পার করে দিই ।

L

সেই লোভে বাড়ে শুধু বেলা... সেই লোভ আমাদের জীবনের চারিধারে করে হাহাকার ।
নিশ্বাসের শব্দ শুনে ছুটে যাই... অমঙ্গল... না, না; ইচ্ছার অতীত । দূরে থেকে তথাপিও

নিয়মিত দীর্ঘশ্বাসের করুন, ভয়াবহ শব্দ শুনি । সাপের মতন ফোসে যথারীতি ।

পায়ের গোড়ালি থেকে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে আস্তে আস্তে মাথার দিকেই উঠে আসে
সাপের মতন । অতঃপর মুখে রাখে মুখ... ভয়ার্ত অস্তিত্ব নিয়ে আমরা চেঁচিয়ে
উঠতেও ভুলে যাই... কিন্তু এভাবেই দিন কাটে আমাদের... দিন কাটে পাথরের...

দিন কাটে নক্ষত্রের... দিন কাটে তমিজের... মুন্সির বেটার রেখে যাওয়া

কানা খোড়া অচল সন্তান সন্ততির । ... তবুও তো সেই লোভে বাড়ে শুধু
বেলা... বাড়ে শুধু হাহাকার... নিয়মিত, চারিদিকে নিয়তির নীরব বিপদ ।

†n‡j bv Lvb

সুরক্ষিত দুর্গের প্রত্যাশায়

প্রথম দিনটি যেন স্বপ্নের ঘোরে কেটে গেল রুবার। বিবাহপূর্ব জীবন অভিজ্ঞতা সম্পৃক্ত নয় বলেই, যার যেভাবে শুরু, প্রাথমিক পর্যায়ে মনে হয়, সেটাই বুঝি স্বাভাবিক।

বধূবরণের সময় তাই শাশুড়ি ও অন্যান্যদের ভিন্নধর্মী সংলাপগুলোকে বিপরীতার্থক বলে প্রতীয়মান হয়নি রুবার কাছে।

ঃ দেখেছ, মেয়ের ভোলই কেমন বদলে দিয়েছি আমরা!

ঃ শাড়ি গহনা ছাড়া কি মেয়েদের মানায়?

ঃ তবে থাক্, এসব প্রসঙ্গ এখন না তোলাই ভালো।

ঃ ঠিক বলেছ, ও পক্ষের কানে কথা গেলে আবার--বেশ কিছু কথার বুদ্বুদ উঠেছে, আপনিই তা মিলিয়ে গেছে।

গুলশানের একটি অট্টালিকার সাজানো কক্ষে বধূর জন্য সংরক্ষিত আসনে বসে এসব শুনেও রুবার মনে তেমন কোন রেখাপাত হয়নি। ধরেই নিয়েছে, মন্তব্য ও বক্তব্যের টানাপোড়েন বিবাহোত্তর কালের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। বিবাহিতা আত্মীয়া ও বান্ধবীদের কাছ থেকে শুনে শুনে এ বিষয়ে তার মোটামুটি একটা ধারণা হয়ে গিয়েছিল।

স্বামী আদীব। কুৎসিত না হলেও তাকে সুন্দর বলা চলে না। রুবার পাশে বেমানান। কিন্তু রুবার তাকে ভালো লেগে গেছে। ভালো লাগাবার মানসিক প্রস্তুতিটা তার কিশোরী জীবনের শুরু থেকেই। মনের আঙিনায় তার আনাগোনা করতো পবিত্র-পরিচ্ছন্ন একটি কুমার। বাহ্যিক সৌন্দর্যের প্রশ্নটা তাই মুখ্য হয়ে ওঠেনি তার কাছে।

সারা অবয়বের মাঝে সুন্দর শুধু আদীবের দু'টি ভাসা ভাসা চোখ। সে চোখের মাঝে রুবা পৃথিবীর যাবতীয় সৌন্দর্য খুঁজে পেয়েছে।

রাতে ভালো ঘুম হয়নি। ঘরের ভেতর শীত শীত আমেজের সাথে একটানা বিজাতীয় একটা শব্দ তার ঘুমের ব্যাঘাত ঘটিয়েছে। এয়ারকুলারে অভ্যস্ত নয় রুবা।

সকালের দিকে তন্দ্রা জড়ানো দু'দোখ তার অভ্যাসের কারণে আপনি খুলে যায়। আজানের মিষ্টি মধুর স্বরে শয্যা ত্যাগের নির্দেশ! 'আস্সালাতু খাইরুম্ মিনান্ নাস্!

বিছানায় উঠে বসে। কিশোরী বয়স থেকে নামাজে অভ্যস্ত সে। নতুন জীবনের শুভ উদ্বোধনে আন্তরিক আরাধনা হবে আজ! ঘুমন্ত আদীবের দিকে তাকায় রুবা। আলতোভাবে তার গায়ে হাত রাখে।

ঃ এ্যাই ওঠ! নামাজ পড়বে না?

ঃ নামাজ!!

বিস্ময়ের একটা প্রচণ্ড ধাক্কা আদীবকে শোয়া থেকে একেবারে বিছানায় বসিয়ে দেয়।

ঃ নামাজ কেন?

ঃ বারে, এ আবার কী প্রশ্ন?

শুয়ে পড়ে আদীব। ঘুম জড়ানো স্বরে বলে, এক শুক্রবার জুম্মার নামাজ ছাড়া আমি অন্য কোন নামাজ পড়ি না, বুঝলে?

– তা, আজ প্রথম দিনে তো পড়!
আদীব বিস্মিত!
ভার্সিটি পড়া মেয়ের আবার একী ধরণ! রুবার গালটা আলতোভাবে ছুঁয়ে পাশ ফিরে শোয় আদীব।
দিন গড়িয়ে চলে।
এ বাড়ির চাল চলনের সাথে খাপ খাওয়াতে গিয়ে অবশ্য হোঁচট খেতে হচ্ছে রুবাকে।
উপলব্ধি তার এখানে ভীষণভাবে বিধ্বস্ত। শুধু খাওয়া আর খাওয়ানো, মুখে রং মাখা, মোছা, ফের নতুন করে রঙের প্রলেপ দেয়া। আর নিত্য নতুন শাড়ি গহনায় নিজেকে সাজানো।
শাড়ির ও অলংকারের চাপে রুদ্ধশ্বাস রুবার শ্বাস টেনে নেবার সুযোগ এল তখন, যখন তার পরীক্ষার ফল বের হলো।
রুবার শ্রম ও সাধনা সার্থক হয়েছে। অনার্সে ফাষ্ট ক্লাস পেয়েছে সে। মা-বাবা, আত্মীয়-স্বজনেরা সবাই খুশি। আদীবও। কিন্তু শ্বশুরের একটি বিশেষ মন্তব্যের নিচে রুবার আনন্দ অনেকটাই চাপা পড়ে গেল।
ঃ মেয়ে মানুষের ভালো পাশ হলেই বা কী, না হলেই বা কী!
আবহাওয়ায় তীব্র শৈত্যতা নামে যখন রুবা এম-এ ক্লাসে ভর্তি হতে যায়।
বড় ননদ আবেদা বলে, এত পড়ে কী হবে বৌ?
মেজো আফিয়া ধুয়ো ধরে।
ঃ বিদ্যা দিগ্গজ হয়ে তুমি তো আর বাইরে চাকরি করতে যাবেনা। আফিয়ার এ হেন কথার পিঠে প্রত্যুৎপন্ন জবাবটা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেরিয়ে আসে রুবার মুখ থেকে।

ঃ বারে, ঘরে অসুবিধা না হলে যাবনা কেন?
ঃ যাবেনা এইজন্য যে, ওই চাকরি করে যে টাকা পাবে, তা দিয়ে এক দিনের শপিংই কুলিয়ে উঠবে না, বুঝলে বৌ রানি?
চুপসে যায় রুবা। কিন্তু সে অল্পক্ষণের জন্য। আত্মসচেতনতার দীপ্ত তেজটা তার মুহূর্তেই বলীয়ান হয়ে ওঠে। দৃঢ় একটি কণ্ঠস্বরের প্রত্যুত্থান হয়।
ঃ টাকার অঙ্কটা অবশ্য খুব কমই থাকে। কিন্তু কাজের যে উদ্দেশ্য তা অঙ্কের গন্ডি ছাড়িয়ে অনেকটা উঁচুতে উঠে যায় না কি?
জবাব শুনে ওরা খিলখিলিয়ে ওঠে কোরাসে।
ঃ বাহ! চমৎকার নাটকীয় সংলাপ তো! তুমি বরঞ্চ নাটক লিখতে শুরু করো!
দিন গড়িয়ে যায়। মাসও। এ বাড়িতে পার্টি-দাওয়াতের হিড়িক লেগেই আছে। সাজানো ঘরে প্রশস্ত, সুদৃশ্য ডাইনিং টেবিলে নানান ধরনের সুস্বাদু ব্যঞ্জন সমৃদ্ধ খানায় অনবরত পরিতৃপ্ত হচ্ছে মূল্যবান অলঙ্কার, শাড়ি, ম্যাকসি-স্যুট পরিহিত অতিথিবৃন্দ।

আজ আতিশয্যের মাত্রাটা যেন সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। রুবার শ্বশুর আমীর আলীর সাথে হল্যাণ্ডের ওয়ার্মগুরের ব্যবসা সংক্রান্ত সরাসরি যোগাযোগের একটা সূচনা হয়েছে। ওয়ার্মগুরের একটি কলমের আঁচড়ে আমীর আলীর দু'তিন লাখ টাকায় লাভবান হয়ে যাবার আশু একটা সম্ভাবনা রয়েছে। কাজেই এই সূচনাপর্বে ডাচ সাহেবকে সবিশেষ সন্তুষ্ট রাখা প্রয়োজন। সাহেবের যা যা পছন্দ সবই যোগাড় করা হয়েছে। ভদ্রলোক ব্যবসা যেমন বোঝেন, মেয়েদের শোভা সৌন্দর্যও বুঝতে পারেন ঠিক তেমনি।

রুবার পাশের আসনটি দখল করে সে কী আলাপ! নিজের দেশের কথা, বাংলাদেশের কথা, হরতাল, লালবাগের কেল্লা, পুরনো রাজধানী সোনারগাঁও থেকে সরাসরি রুবার রুপের নিভাঁজ প্রশংসা! এমন সুইট লেডী শুধু হল্যাণ্ড ও বাংলাদেশেই নয়, পৃথিবীর বহু জায়গা ঘুরে কোথাও সে এমনটি দেখেনি!

সাহেবের নির্লজ্জ চাহনি ও তার একান্ত গা ঘেঁষে বসার মাঝে রুবা অশুচির স্পর্শ পায় । আশ্চর্য! শ্বশুর শাশুড়ির তা দেখেও না দেখার ভান করেন! বিপন্ন অস্বাচ্ছন্দ্যতার মধ্যে কিছুক্ষণ ছটফট করে কোন এক অজুহাত দেখিয়ে পর্দা ঠেলে ভেতরে চলে যায় রুবা ।

কিন্তু তাতেও রেহাই নেই । কিছুক্ষণ পরেই শ্বশুর শাশুড়ি তাকে ডেকে পাঠান ।

নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও উঠে এলো রুবা । কিন্তু ঘরে ঢুকতে গিয়ে একী!! মাথাটা তার হঠাৎ ঘুরে গেল । পা দু'টো তার মোজায়িক করা মেঝের সাথে সুরক্ষিত দূর্গের প্রত্যাশায় আটকে যায় । দৃষ্টি তার আকাশ থেকে পাতালে আছড়ে পড়ে নিথর হয়ে গেছে । এ কী দেখছে সে!! সাহেবের গ্লাসে তরল মাদক নিজের হাতে ঢেলে দিচ্ছেন তারই প্রৌঢ়া সুসজ্জিতা শাশুড়ি জাহেরা আলী! আর ওদিকে স্মিত হাসিতে উদ্ভাসিত শ্বশুর ও স্বামী একটু একটু করে চুমুক দিচ্ছে নিজেদের গ্লাসে ।

এতোদিন বাইরের বৈভবে বিব্রত ছিল রুবা । আর শুধু ভেতরে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত নয়, শারীরিক ও মানসিক উভয় দিক থেকেই নিদারুণভাবে বিস্রস্ত হলো সে ।

ড্রইংরুমে ঢুকে ক্ষিপ্রবেগে ফিরে গেল নিজের কামরায় । বিছানায় আছড়ে পড়ল ।

বকশীবাজারে দাদার আমলের ছোট একতলা বাড়ির নিখাঁদ পবিত্রতায় সিক্ত দৃশ্যাবলীর সাথে আজকের দৃশ্যের তুলনা করে রুবা ।

অতিথিরা চলে গেলে রুবাকে দাঁড়াতে হলো শক্ত কাঠগড়ার সামনে । অত্যন্ত অসন্তুষ্টির কারণে শ্বশুরের চিবুকের পাশ শক্ত হয়ে উঠেছে ।

ঃ এটিকেট কাকে বলে এখনো শেখনি দেখছি! ওদিকে তো আবার অনার্সে ফার্ষ্টক্লাস পাওয়া । আদত আদবে গড়ে ওঠা রুবা শ্বশুরের কথার জবাব দিতে পারে না । রীতিমতো ঘেমে উঠেছে সে । সামগ্রিকভাবে ঘটনাটা তলিয়ে দেখল । ক্ষণিকের জন্য দুর্বলতার শিকার হলো । কিন্তু শীঘ্রই প্রচণ্ড এক শক্তিতে বলীয়ান হয়ে এক লাফে পার হয়ে এল অহেতুক সঙ্কোচ ও আশঙ্কার কাঁটাতারের বেড়াগুলো ।

এক নিঃশ্বাসে অনেক গুলো কথা বলে ফেলল । বিদেশীদের কাছে নিজের সত্তা বিলীন করে দেয়ার কোন রকম আচরণকে আমার কাছে মোটেও এটিকেট বলে মনে হয় না । তাছাড়া, আমার আব্বা তিনি তো তিন বছর লণ্ডন থেকে পড়াশোনা করেছেন । তাকে বলতে শুনেছি ওসব দেশে গিয়ে যারা নিজেদের কৃষ্টি, ঐতিহ্য বা ধর্মের ধারা বজায় রেখে চলে, তাদের বরঞ্চ ওদেশের লোকেরা শ্রদ্ধার চোখেই দেখে ।

মুখের কথা কেড়ে নিলেন শাশুড়ি ।

ঃ আর যাই হোক্ বক্তৃতা দেয়াটা তুমি খুব ভাল ভাবেই রপ্ত করে নিয়েছ! আমরা বক্তৃতা জানিনা, বুঝিও না । বুঝি শুধু বাস্তব দুনিয়া । এই যে সংসারের জন্য কাড়ি কাড়ি টাকা রোজগার করছে তোমার শ্বশুর, রোজগার করতে চেষ্টা করছে তোমার স্বামী, সে টাকাটা অনায়াসে পাবার জন্য কারো সাথে বসে দু'এক ঢোঁক কিছু গিলতেই হয়, তাকে কোন রকমেই অন্যায় বলা চলে না, বুঝলে?

নতমুখী রুবার মুখ থেকে আর কোন শব্দ বের হয় না । বুঝলো এখানে ন্যায়-নীতির সংজ্ঞাগুলো পুরোপুরিভাবে সুযোগ-সুবিধা বিশেষ করে অর্থের শেকলে নিগূঢ়ভাবে গ্রথিত । রুবার দৃঢ় সন্নিবদ্ধ মুখের দিকে দৃঢ় কঠোর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে চলে যান শ্বশুর ও শাশুড়ি ।

আদীব অবশ্য মা-বাবার মতাদর্শের সাথে পুরোপুরি একাত্ম হতে পারছে না । তবু সেই পুরনো প্রসঙ্গ – অধিক লাভের বদলায় ছোট কোন অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয়ার যৌক্তিকতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইল ।

বিক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হতে গিয়েও রুবা নিজেকে গুটিয়ে নিল । ধীর কণ্ঠে বলল –
ঃ দেখ, তোমরা সবাই আমার মুরুব্বি । কিন্তু তবু ন্যায়-নীতি, পবিত্রতা, হালাল ও হারামের প্রশ্ন যেখানে, সেখানে আমি তোমাদের কোন যুক্তিই শুনতে চাই না ।
ঃ তুমি দেখছি বড় বেশি 'ফাসি'! তুচ্ছ এক ড্রিংকসের ব্যাপার নিয়ে এতটা বাড়াবাড়ি কিন্তু আমার মোটেই ভাল্লাগ্ছে না ।
রুবার কাজল কালো চোখ দু'টো সজল হয়ে ওঠে । সেদিকে তাকিয়ে আদীবের বুকটা মমতায় ভরে যায় । প্রসঙ্গান্তরে যাবার পথ খোঁজে সে । বলে- আচ্ছা বলত তুমি এত সুন্দরী, তার ওপর ছাত্রী ভালো, তোমার তো উপযুক্ত সুন্দর পাত্রের অভাব হতো না । অথচ তোমার আব্বা ও আত্মীয় স্বজনেরা আমাদের তরফ থেকে বিয়ের প্রস্তাব পাঠাবার সাথে সাথেই দেখি তোমরা রাজি হয়ে গেলে ।
রুবার দু'চোখে থমকে থাকা অশ্রুরাশি এবার অনিবার্যবেগে ঝরে পড়ে ।
আদীব বধূর চোখের পানি মুছে দেয় ।
ঃ কী হলো? এতে কান্নার কী হলো?

ঃ না, কিছু না! আব্বা কেন রাজি হয়ে গিয়েছিলেন জিজ্ঞেস করছিলে না? প্রতি শুক্রবার বায়তুল মোকাররম মসজিদে তোমাকে ও আমার শ্বশুরকে নামাজ পড়তে দেখে তিনি তোমাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন, সে জন্য ।
আদীব এ কথা আগেও শুনেছে । বলল–
ঃ কিন্তু নামাজ পড়লে এটা করা যাবে না, ওটা করা চলবে না, এমন নির্দেশ আব্বা মানেন না, আমিও না । আরে, নামাজের জন্য যে পূন্য, সে পূন্য তো আলাদাভাবেই তোলা থাকবে ।

এই মুহূর্তে রুবার অন্তরাত্মা চিৎকার করে কিছু বলতে চাইলো । কটাক্ষের তীব্রতায় স্বামীকে জর্জরিত করতে ইচ্ছে হলো । .... বাঃ! চমৎকার ঈমানদার সব নামাজীরা! চমৎকার তাদের যুক্তি আর ধর্মানুশীলনের সব পদ্ধতি!
আকস্মিক উত্থিত প্রচণ্ড এক ঘূর্ণিতে প্রবল বেগে আবর্তিত হলো রুবা । এলোমেলো ভাবনায় আন্দোলিত হলো ।
না, ওদের সাথে সরাসরি সে পেরে উঠবেনা । নিজেদের সৃষ্ট জগতের আইন যাদের হাতিয়ার, তাদের কাছে একুশ বছরের একটি তরুণীর বক্তব্যকে শুধুমাত্র অর্বাচীনের প্রগলভ প্রলাপ বলেই কি প্রতীয়মান হবে না?
তার চেয়ে থাক্.....
সুরক্ষিত অদৃশ্য এক দুর্গের মাঝে কৌশলে সে নিজেকে লুকিয়ে রাখবে । গোপনে চারপাশে তার সুগভীর পরিখা খনন করিয়ে নেবে । ..... নিজেকে বাঁচাবে, স্বামীকে উদ্ধার করবে; আর হ্যাঁ, এদের এই আবিলতা ও কুলষতা থেকে বহু যোজন দূরে সরিয়ে নেবে ভবিষ্যতের তার অনাগত বংশধরদের । চমৎকার তাদের যুক্তি আর ধর্মানুশীলনের সব পদ্ধতি ।
আকস্মিক উত্থিত প্রচণ্ড এক ঘূর্ণিতে প্রবল বেগে আবর্তিত হলো রুবা । এলোমেলো ভাবনায় আন্দোলিত হলো ।
না, ওদের সাথে সরাসরি সে পেরে উঠবেনা । নিজেদের সৃষ্ট জগতের আইন যাদের হাতিয়ার, তাদের কাছে একুশ বছরের একটি তরুণীর বক্তব্যকে শুধুমাত্র অর্বাচীনের প্রগলব প্রলাম বলেই কি প্রতীয়মান হবে না?
তার চেয়ে থাক্...
সুরক্ষিত অদৃশ্য এক দুর্গের মাঝে কৌশলে সে নিজেকে লুকিয়ে রাখবে । গোপনে চারপাশে তার সুগভীর পরিখা খনন করিয়ে নেবে । ..... নিজেকে বাঁচাবে, স্বামীকে উদ্ধার করবে; আর হ্যাঁ, এদের এই আবিলতা ও কলুষতা থেকে বহু যোজন দূরে সরিয়ে নেবে ভবিষ্যতের তার অনাগত বংশধরদের!

হোমায়রা আহমেদ

চোখ

ছাদে কাপড় মেলতে এসে সামনের বাড়ির জানালায় চোখ পড়েতেই দেখে সেই ড্যাবড্যাবে চোখ দুটো চেয়ে আছে তার দিকে। মেজাজ বিগড়ে গেল শোভার। কাম কাজ নেই নাকি লোকটার? কাজের দিনে, ছুটির দিনে যখনই ঐ জানালায় চোখ পড়ে দেখে লোকটা তাকিয়ে আছে তাদের বাড়ির দিকে। তাড়াহুড়ো করে কাপড় মেলে, দুপদাপ পা ফেলে নেমে এলো শোভা। রোববারের সকালটাই মাটি।

কায়সার আজ জার্নালিজমের কাজে ঢাকার বাইরে যাবে, ছুটির দিন বলে শোভাও যাবে সঙ্গে। তাড়াতাড়ি একটা ব্যাগে এক রাতের সমান দরকারী কাপড় চোপড়, টুথব্রাশ ভরে কাপড় পাল্টাতে গেল শোভা। শোবার ঘরের পর্দাটা টেনে দেবার সময় আবার চোখ দু'টো চোখে পড়ল। যাকগে, কি দরকার মাথা ঘামিয়ে? গলির ধারের বখাটে হ্যাংলা ছেলেগুলো বড় হয়েও স্বভাব বদলায় না, কি আর করা যাবে?

দু'মাস হল এ পাড়ায় এসেছে নতুন দম্পতি শোভা আর কায়সার। সবে মাত্র ইন্জিনিয়ারিং পাশ করে সরকারী কাজে ঢুকেছে শোভা। ছিমছাম ন'টা পাঁচটা অফিস, কোন কাজের চাপ নেই। অন্যদিকে ঢাকা ইউনিভার্সিটির মেধাবী ছাত্র কায়সার, পাশ করার সাথে সাথে চৌকস জার্নালিস্ট হিসেবে প্রতিষ্ঠিত সংবাদপত্রে নিজের স্থান করে নিয়েছে।

কায়সারের অবশ্য কাজের কোন নির্দিষ্ট সময় নেই, যখন তখন প্রয়োজনীয় সংবাদ সংগ্রহে তাকে বেরুতে হয়। বিয়ের প্রথম বছর, স্বাভাবিক কারণেই হাসিখুশি আনন্দে সময় উড়ে যাচ্ছিল ওদের। এমনি এক বিকেলে খাবার ঘরের চিলতে বারান্দায় দু'জন বসে চা খাচ্ছিল আর কারণে অকারণে হেসে গড়িয়ে পড়ছিল।

হঠাৎ টেলিফোন এলো, জরুরী প্রয়োজনে কায়সারকে বেরিয়ে পড়তে হল। একা থাকলে অকারণেই শোভার মনটা বিষন্ন হয়ে যায়। রেলিংএ ঝুঁকে আকাশ দেখতে দেখতে দৃষ্টি যায় পাশের ফ্ল্যাটবাড়ির তিন তলার জানালায়, আর সেদিনই প্রথম চোখে পড়ে ড্যাবড্যাব দু'টো চোখ নিষ্পলক তার দিকে চেয়ে আছে।

প্রথম অস্বস্তিতে চোখ সরিয়ে নেয় শোভা। এক্কাদোক্কা খেলায় ব্যস্ত মেয়েগুলোর দিকে মনোনিবেশ করে। একটু পরে আড় চোখে চেয়ে দেখে, দিব্যি জানালায় মুখ বের করে লোকটা তেমনি নিষ্পলক চেয়ে আছে তার দিকে। অস্বস্তিতে মনটা বিষিয়ে গেল, ঝট করে চায়ের পেয়ালা তুলে নিয়ে ভেতরে চলে গেল শোভা।

সেই থেকে ঐ চোখ দুটো তার পিছু ছাড়েনি। আজকাল এমন হয়েছে, অফিস থেকে ফিরেই জানালার পর্দা সরিয়ে দেখে লোকটি অপেক্ষায় আছে কিনা, আর দেখা মাত্রই বিরক্তিতে মন ছেয়ে যায়।

শোভা কি করবে বুঝতে পারে না। কায়সার বাড়িতে না থাকলে, না পারে জানালায় দাঁড়াতে, না পারে বারান্দায় বসতে। কেবল ঘরের ছাদের দিকে তাকিয়ে ভাবতে চেষ্টা করে কেন ঐ গোঁফ-দাড়িওয়ালা লোকটা তাদের বাড়ির দিকে চেয়ে থাকে? কি চায় সে?

সারাদিন অফিস করে বাড়ি ফিরে সামাজিকতা করার সময় থাকে না। তাই আশে পাশে কারো সাথে বিশেষ পরিচয় হয়নি, শুধু দোতলার পারভীনের সাথে আলাপ আছে। মেয়েটা ঢাকা ইউনিভার্সিটির সমাজ কল্যাণ বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী, কি একটা রিসার্চের কাজে কায়সারের কাছে এসছিলো।

বেশ চোখ কান খোলা মেয়ে। এমনি ধরণের আরও মেয়ের প্রয়োজন আমাদের দেশে, যারা সচেতন নাগরিক হিসেবে ছেলেদের পাশাপাশি নিজেদের স্থান করে নিতে পারবে। পারভীনের ওখানে গেলে কেমন হয়, ওরা তো অনেক দিন এ পাড়ায় আছে, ও অন্য রকম মেয়ে। নিশ্চয়ই ঐ বাড়ির লোকটাকে চিনবে।

সোফায় সোজা হয়ে বসল শোভা। ঘড়ির দিকে তাকাল একবার, সন্ধ্যে সাতটা বাজে। কায়সার না থাকলে কিছুতেই সন্ধ্যেটা কাটতে চায়না। চুল আঁচড়ে তাঁতের শাড়ী বিন্যস্ত করতে করতে মনটা আবার দমে গেল, নাহ, গিয়ে কাজ নেই, পারভীন যদি আবার কিছু মনে করে? একজন বিবাহিত মহিলার পাশের বাড়ির পুরুষ লোক সম্বন্ধে প্রশ্ন করা অশোভন কাজ হবে। ক্যাসেটে রবীন্দ্র সঙ্গীত ছেড়ে দিয়ে চুপ করে বিছানায় এলিয়ে পড়ল শোভা।

'তুমি মোর পাও নাই পরিচয়,
তুমি যারে জানো সে যে কেহ নয়, কেহ নয়...'

গান শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ল শোভা। স্বপ্ন দেখল সরু লম্বা রাস্তা, ছায়া ছায়া অন্ধাকার, কেউ কোথাও নেই। সে একা হেঁটে চলেছে, হঠাৎ পেছন ফিরে দেখে সেই চোখ দু'টো তাকে অনুসরণ করছে। কোন শরীর নেই, শুধু দু'টো চোখ।

থমকে দাঁড়ায় শোভা, আবার পেছনে দেখে। চোখ দু'টিও দাঁড়িয়ে পড়েছে। গা ছমছম করে ওঠে, তাড়াতাড়ি পা চালায় শোভা। তাকিয়ে দেখে চোখ দু'টিও আবার চলতে শুরু করেছে। হঠাৎ কে যেন পেছন থেকে তাকে জড়িয়ে ধরল, ওর শ্বাস বন্ধ হয়ে এলো, চিৎকার করে ঘুম ভেঙে উঠে বসল শোভা, দেখে পাশে কায়সার। কায়সার দুঃখ প্রকাশ করে বলে–

ঃ ইস্, ভয় পেলে নাকি? এই ভর সন্ধ্যে বেলা ঘুমিয়ে কেন?

চোখ কচলে উঠে দাঁড়াল শোভা। স্বপ্নের ব্যাপারটা চেপে গিয়ে বললো–

ঃ এত দেরী করলে কেন? খিদে পেয়েছে, খাবে এসো।

খাবার টেবিলে বসে একবার মনে হল কায়সারকে ব্যাপারটা খুলে বলে, লোকটাকে একটু শিক্ষা দেয়া দরকার। আবার ভাবল, কি হতে কি হয়ে যায় বাবা কে জানে; কি দরকার ঝামেলায় গিয়ে। আর তাছাড়া এ ফ্ল্যাট বাড়ির অন্য কারো যদি অসুবিধা না হয়, তার কি বাড়াবাড়ি করা উচিৎ হবে? লোকটি তার দিকে তাকায় না অন্য কারো দিকে তাকায় কে জানে?

সেদিন একটু সকাল সকাল বাড়ি ফিরেছে শোভা, কায়সারের বন্ধু সেলিমদের বাড়ি আজ রাতে খাবার দাওয়াত। গোসল সেরে কাপড় পরতে এসে জানালায় দাঁড়াল শোভা, একি। সেই চোখ দু'টো নেই। কেমন যেন একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো। কিন্তু অবাক কাণ্ড। তৈরি হবার ফাঁকে ফাঁকে একশোবার পর্দা সরিয়ে দেখল শোভা।

নিজের ওপর ভীষণ রাগ হল তার, এ কিসের প্রতীক্ষা? নাকি অভ্যেস? রিক্সায় যেতে যেতে ভেতরে কেমন একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি অনুভব করল। চেনা জিনিস হারিয়ে গেলে যেমন লাগে, অথচ জিনিসটি তার প্রিয় ছিল না মোটেই। পরদিনও লোকটিকে দেখা গেল না। তারপর দিন ছুটির দিন। সকাল থেকেই ও বাড়িতে লোকজনের নড়াচড়া বোঝা যাচ্ছে। শোভা লক্ষ্য করে দেখার চেষ্টা করল। মনে হল অনেক আত্মীয়-স্বজন, কথা-বার্তার আওয়াজ। সম্ভবতঃ কোন অনুষ্ঠান চলছে।

ঘর পরিষ্কার শেষ করে মন দিয়ে রান্না করছিল শোভা। দুপুরের দিকে সমবেত আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার শব্দে ছুটে বারান্দায় এলো; পাশের ফ্ল্যাট বিল্ডিং থেকে সাদা কাপড়ে ঢাকা একটা লাশ নামানো হচ্ছে। বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। পায়ে স্যান্ডেল গলিয়ে তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় পারভীনদের বাড়ি এলো। অসময়ে শোভাকে দেখে অবাক হল পারভীন।

ঃ আসেন শোভা আপা, ভেতরে আসেন। এগিয়ে এলো পারভিন।

ওদের বাড়ির সকলে জানালায় ঝুঁকে প'ড়ে লাশ নামানো দেখছে, মন্ত্রমুগ্ধের মত ওদের পেছনে গিয়ে দাঁড়িয়ে ঘাড়ের ওপর দিয়ে উঁকি দেয় শোভা। জিজ্ঞেস করে--

ঃ কে মারা গেছে পারভীন?

খুব স্বাভাবিক ভাবেই পারভীন উত্তর দেয়--

ঃ উনি মোজাফ্‌ফর ভাই, ঐ যে দেখেননি তিন তলায় জানালায় দাঁড়িওয়ালা লোকটাকে সব সময় দেখা যেত।

ঃ উনি কি অসুস্থ ছিলেন?

উৎসুক চোখে এক নিঃশ্বাসে প্রশ্ন করে শোভা।

ঃ ও আপনি বুঝি জানতেন না, একাত্তুরের স্বাধীনতা যুদ্ধের আগে উনারা নিউমার্কেটের পাশে পুলিশ ব্যারাকের কাছে একটা বাড়িতে থাকতেন। পঁচিশে মার্চের রাতে যখন গুলি শুরু হয় মোজাফ্‌ফর ভাই ঘুম ভেঙে জানালায় এসে দাঁড়াতে উনার মাথায় গুলি লাগে, সেই থেকে উনি জানে বেঁচে ছিলেন কিন্তু ব্রেন নষ্ট হয়ে যাওয়াতে নড়াচড়ার স্বাভাবিক শক্তি হারিয়ে যায়।

শোভা হা করে তাকিয়ে আছে পারভীনের দিকে। পারভীন বলে চলেছে--

ঃ মোজাফ্‌ফর ভাই কথা বলতে পারতেন না, কিছু বুঝতেও পারতেন না, কেবল ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকতেন। উনার চোখ দু'টি ছিল ভারি সুন্দর, ভাসা ভাসা, তবে ওতে দৃষ্টি ছিল কিনা বোঝা যেত না। সকাল বেলা হুইল চেয়ারে তাকে জানালার সামনে বসিয়ে দেয়া হত, সারাদিন বেচারা বাইরের দিকে তাকিয়ে বসে থাকতেন। এতদিনে তিনি স্বস্তি পেলেন, জীবন তাকে কিছুই দেয়নি শোভা আপা।

শোভার মুখে কথা সরল না, কেবল বেরিয়ে এলো--

ঃ ও।

বিদায় না নিয়ে হনহন করে উপরে চলে এলো শোভা। বারান্দায় দাঁড়িয়ে তাকিয়ে রইল শূন্য জানালার দিকে, চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। কায়সার এস পাশে দাঁড়িয়েছে, শোভার দিকে চেয়ে অবাক চোখে তাকিয়ে আছে। ঘরে এসে কান্নায় ভেঙে বড়ল শোভা, কায়সারকে তার এতদিনের অস্বস্তির কথা সব খুলে বললো; নিজের ওপর ঘৃণায়, লজ্জায়, যন্ত্রণায় অনেকক্ষণ কাঁদল। তারপর এক সময় চোখে মুখে পানি দিয়ে এসে শান্ত হয়ে বসল।

কায়সার মাথার পেছনে দু'হাত ভাঁজ করে দিয়ে লম্বা হয়ে শুয়ে আছে চিন্তিত মুখে। শোভা প্রশ্ন করে,

ঃ আচ্ছা বলতো, আমরা যে সমাজে বড় হই সেখানে খারাপ ছাড়া ভাল চিন্তা কেন মাথায় আসেনা প্রথমে? অথচ আমি সচেতনভাবে সনাতন অন্ধবিশ্বাসে বিশ্বাসী নই।

ঃ সেটা আমারও প্রশ্ন শোভা। তবে তুমি যে এটা বুঝতে পেরেছ এটাই আমার গর্ব।

ঃ আমরা এই গন্ডি থেকে কখনই বেরিয়ে আসতে পারব না?

ঃ পারতেই হবে শোভা; ধীরে ধীরে আমাদের মুক্ত চিন্তার দুয়ার খুলতেই হবে।

ঃ জানো, লোকটাকে আমি মনে মনে কত গালি দিয়েছি, বলেছি মরণ হয় না কেন ওর।

ঃ ওদের বাড়ি যাবে শোভা? চল তোমার হয়তো ভাল লাগবে।

ওরা দু'জন মোজাফ্‌ফরের ঘরে এসে দাঁড়াল, জানালা দিয়ে নিজেদের বাড়ির জানালায় তাকাল। ভেতরে স্পষ্ট কিছুই দেখা যায় না। শূন্য হুইল চেয়ারটা ছুঁয়ে দেখল শোভা। শরীর বেয়ে ঠাণ্ডা শিরশিরে অনুভূতি নেমে গেল।

সেদিন রাতে ভাল ঘুম হল না শোভার। শেষ রাতের দিকে ঘুম এলো; আশ্চর্য, সেই একই স্বপ্ন দেখল শোভা। সেই রকম সরু নির্জন লম্বা পথে হেঁটে চলেছে সে। কেবল চোখ দু'টো এবার পেছনে নয়, সামনে; শোভা তাকে অনুসরণ করছে। আজ তার ভয় করছে না। কিছুদূর যেতেই দূরে চোখে পড়ল আধো ওঠা ভোরের সূর্য।

সকালে ঘড়ির এ্যালার্মে ঘুম ভেঙে গেল। জানালা দিয়ে ভোরের মিষ্টি রোদ এসে পড়েছে বিছানায়। উঠতে ইচ্ছে হল না শোভার, অনেকক্ষণ বালিশে মাথা রেখে শুয়ে রইল।

BKev j nvmvb

সে আর ফেরে না

এই যে সিল্কের রুমালের মতো হাত নেড়ে চলে যায়

ফুরফুরে দিনগুলো
এই যে চোখের নিচে কিছুটা কালির ছটা লেপে দিয়ে
পালায় দুপুর
এই যে কলমি ছায়ার নিচে মাছেরা পেতেছে সংসার
চলে যায় সেইসব মাছেরাও
এই যে সময়ের আড়ালে কতো ঝরে যায়
ধূ ধূ র্নিজনতা
এই যে পরম দুঃখের মতো ক্রমশ ভাটির দিকে
নেমে যায় নদী
জীবনের দেয়াল গাত্রে সেইসব চিহ্নগুলো লেগে থাকে যদি
কী এমন এসে যায়!

তুমিও তো এরকম চলে গিয়েছিলে, বড় আকস্মিক
মানুষেরা ব্যথা পায় ব্যথার মতন কিছু পেলে
বিষণ্ন জানালার মতো আমারও কষ্ট ছিল
একটানা কিছুকাল....

তবু আমি কতোবার খুলেছি হৃদয় যদি ফিরে আসো
যেমন অপরাহ্নের পাখিরা ফিরে আসে ঘরে
যেমন যুদ্ধের শেষে ফিরে আসে বিজয়ী সৈনিক
যেমন ঘুমের ভিতর স্বপ্নের মতোন ফিরে আসে স্মৃতি

বড়ই নির্বোধ আমি কী করে জানব
যে যায় সে আর ফিরে আসে না কখনো!

hLb †W‡KQ Zwg (ইকবাল হাসান)

ডেকেছিলে, আসি নি তখন
বর্ষার টলটলে পুকুর যেমন দূরের রাজহাঁসগুলোকে ডাকে
তুমিও তেমনি ডেকেছিলে। আসি নি তখন

মেঘের মিনার থেকে বৃষ্টি এসে ডেকেছিল
ভোরের বাগান থেকে ডেকেছিল অজস্র চামেলী
দুপুরের নগ্ন ধু ধু নির্জনতা ডেকেছিল ছাদের কার্নিসে
অপরাহ্নের কালো কাক–তুমিও তো ডেকেছিলে, আসি নি তখন

হাসপাতালের শীতল কেবিন জুড়ে
ঘুরে ঘুরে মৃত্যু যেভাবে ডাকে–না না সেভাবে নয়
কংক্রিটের কালো বুকে শেষ বাস চাপা পড়ে
মুমূর্ষু মানুষ যেভাবে ডাকে–না না সেভাবে নয়
বয়স পেরিয়ে গেলে অমাবস্যার গাঢ় অন্ধকার
যে রকম পিছু ডাকে বারবার–না না সেভাবেও নয়

সাহসী হাতকে যেভাবে ডাকে ফুলে ওঠা ঘোড়ার কেশর
বয়োবৃদ্ধ মানুষকে যেভাবে ডাকে শৈশবের সোনার লাটিম আর
পালতোলা নৌকো যেমন তীরের মাঝিকে ডাকে গভীর নদীতে
তুমিও তেমনি ডেকেছিলে, আসি নি তখন।

আজ এই অবেলায় সারাপথ ঘুরে ঘুরে
তোমার দুয়ারে দ্যাখো দাঁড়িয়ে রয়েছি

তুমি তো ডাকো নি!

সন্ধ্যার তৈলচিত্র

তোমার আহ্লাদগুলো সাদা হাঁস। পালকের
ছোঁয়া। আকাশে বাড়ায় শোভা মেঘের মমতা।
নিসর্গের বিপরীতে তুমি স্নিগ্ধ সন্ধ্যার
ধূসর আলোয়। অন্ধকার জানে সেই রূপের মহিমা।

কিছুটা তুমিও জানো। আকাশ কখনো এসে
স্পর্শ করে না, তবু ভ্রম; আটলান্টিক ছুঁয়েছে অই
দূরের আকাশ। তোমার শাড়ির নীল
ফুটে থাকে সন্ধ্যার পুরো দৃশ্য জুড়ে।

কেবল আকাঙ্ক্ষাগুলো গ'লে গ'লে
সেই দৃশ্যে অভিঘাত কিছুটা বাড়ায়।

ডুবে চাঁদ জলের অতলে

একদিন এলিভেটরে তোমার বাঁকানো গ্রীবার দিকে চোখ পড়তেই
মনে হয়েছিল, যেখানে নদীর বাঁক সেখান থেকেই ভালোবাসার শুভ
সূত্রপাত। আজকাল, মাঝেমধ্যে স্তব্ধ হয়ে থাকে চাঁদ জলের উপরে।
বাড়ির পিছনে লেক, আমি তার গভীর অতলে শুয়ে থেকে ভাবি–
ফুলেরাও ভালোবাসে পরস্ত্রীর সবুজ উদ্যান। ফল-এর দিকে এদিকটায়
শীত নামে বেশ, আর তুমি রাঙামাটি থেকে কেনা, হাতে বোনা,
চাঁদরে নিজেকে ঢেকে পায়ে মাখো হেমন্ত শিশির.., আমি দেখি,
সব দেখি, আমি সব দেখতে পাই। বুক জ্বলে।

আমি আর কতোকাল শুয়ে থাকব জলের অতলে?

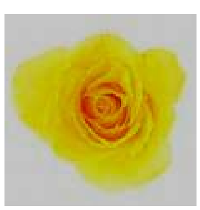

আকাশলীনা ২০০৬

দুঃখ-কষ্টের গল্প

BKevj nvmvb

এতটা রোগাটে ছিল না আমাদের বিশখালি। বেশ টলটলে চেহারা ছিল একসময়। তবে রোদ-বৃষ্টি যাই হোক উজান-ভাটায় থমথম করতো মুখ। বড় অভিমান।

রাত্রি এলে অন্ধকারে দু'কূল তলিয়ে যেত, চোখের আড়াল হতো বনভূমি। তখন এপার-ওপারের ব্যবধান বোঝা কার সাধ্য। কিছুই দেখা যেত না। শুধু অন্ধকারের মানুষের দুঃখ-কষ্টের কুপিগুলো জ্বলত ছিটেফোঁটা নৌকায়।

এই ছিল বিশখালি, আমাদের বাড়ির একেবারে কাছে। বিশখালির পাশে আমি বড় হয়েছি, শুনেছি বাবাও। এক সময় মাছ ধরার শখ ছিল বাবার। এখন বার্ধ্যক্যের নিরীহ সময় যাচ্ছে তাঁর। কাঁধে জালে আর খারোই হাতে ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টিতে যখন-তখন বেরিয়ে পড়ার মতো বয়স আর কোথায় পাবেন তিনি। অবশ্য আমরা এখন যেখানে থাকি সেখানে নদী নেই, জলের গন্ধ নেই। আছে গ্রিল দেয়া ব্যালকনি, ইউক্যালিপটাসের ঝিরঝিরে পাতা আর ঘাসের কার্পেট।

বাবা সারা দিন বসে থাকেন বারান্দায়। বৃষ্টির দিনে তাকিয়ে থাকেন প্রকৃতির দিকে, একদৃষ্টে। মাঝে মাঝে বলেন, তোর বৃষ্টিতে নদী দেখতে ভালো লাগে? নদী, মাছের গন্ধ, ফিরে এসে পুকুর ঘাটে জলকাদা লাগা পা ধোয়া, এইসব ভালো লাগে তোর? আমি কিছু বলি না। শুধু তাকিয়ে বাবাকে দেখি–মাথাভর্তি পাকা চুল, গর্তের ভেতরে ডুবে যাওয়া চোখের কুচকুচে মণিতে অপরাহ্নের খেলা। আমাকে নিশ্চুপ দেখে বাবা ধ্যানী মানুষের মতো বলতে থাকেন, জলের একটা আলাদা গন্ধ আছে। বৃষ্টিতে টের পাওয়া যায়।

আমি জলের ভেতর কোনো আলাদা গন্ধ পাই না শুধু বাবার একাকিত্বের কষ্টটুকু টের পাই আজকাল।

মা নেই সেই ছোটবেলা থেকে। পরীখালা, যাকে আমি দীর্ঘকাল মা বলে ডেকেছি–তিনি আসলে বাবার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। বিয়ের আগে মাঝে মাঝে আমাদের বাড়ি আসতেন এই পরীখালা। গল্প ফেঁদে বসতেন। তাকে আমার পছন্দ হতো না, এলেই ইনিয়ে-বিনিয়ে গল্প জুড়ে দিতেন মায়ের সঙ্গে–মাকে কাছে পেতাম না। কখনো আমাকে কাছে পেলে মার অগোচরে চোখ রাঙাতেন পরীখালা। ভয় পেয়ে পালিয়ে যেতাম আমি।

মা জীবিত থাকতেই বাবা আর একবার হলুদ মেখেছিলেন। আমি তখন একেবারে ছোট। মনে পড়ে, বাবা সেদিন গাঁয়ের লোক জড়ো করেছিলেন। আমাদের উঠোনভর্তি লোক। বরযাত্রী যাবে পাশের গাঁয়ে–পরীখালাদের বাড়ি। বাবা ফিনফিনে পাঞ্জাবি পরে বেরিয়ে আসছিলেন, এমন সময় মা হঠাৎ কোত্থেকে ছুটে এসে বাবার পা দুটো জড়িয়ে ধরে মাথা ঠুকতে লাগলেন। যারা এসেছিল সবাই স্তব্ধ হয়ে থাকল, কেউ সাহস পেল না কিছু বলার। মা উঠোন ভর্তি লোকের মাঝে চিৎকার করে কাঁদলেন। আমি সে কান্নার অর্থ বুঝতে পারিনি সেদিন।

গভীর রাতে বাবা টুকটুকে লাল পরীখালাকে নিয়ে এলেন। আর মা সারা রাত পুকুর ঘাটে বসে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে কাঁদলেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। আমি তাঁর কান্নার ভেতর ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। মায়ের কোমল বুকে ঐ আমার শেষ ঘুম। পরদিন মাকে পাওয়া গেল বাড়ির দক্ষিণ দিকের পুকুরের জলে, শাপলা পাতার আড়ালে। ঠাণ্ডা, হিম, ফ্যাকাশে ভয়ঙ্কর সাদা আমার মাকে ঐ আমার শেষ দেখা।

সেই থেকে আমার কষ্টের শুরু।

আমার এক মামা ছিলেন টুনুমামা। ভয়াবহ রকম কালো আর বেঁটে। মাথার সব কটা চুল তার সাথে বিট্রে করেছিল বোধ করি আমার জন্মের আগেই। এই টুনুমামা যখন ভুলক্রমে চুলের মধ্যে আঙুল চালানোর মতো করে নিজের মাথায় হাত বুলোতেন, আমরা মাটির দিকে মুখ নামিয়ে হাসতাম, নিঃশব্দে।

টুনুমামা সম্পর্কে আমার তখন সীমাহীন আগ্রহ। যদিও উনি আমাদের কেমন মামা তা জানতে পারিনি কোনোদিন। পরীখালা একদিন বলেছিলেন, তোর মামা, সালাম কর্। ব্যস, সেদিন থেকে টুনুমামা আমার মামা। বাবাকে একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম, বাবা ধমকে উঠেছিলেন। টুনুমামা সম্পর্কে আগ্রহ দেখালেই ধমকে উঠতেন বাবা, লাল হয়ে উঠত তার চোখ। রহস্য!

কোনো জিনিস নিয়ে বেশি নাড়াচাড়া করতে নেই, ভেঙে যায়। আমি টুনুমামার রহস্য ভাঙাতে চাইনি। বাবা থাকতেন শহরে, ছুটিছাটায় বাড়ি আসতেন, ফিরে যেতেন। টুনুমামা আসতেন নিয়মিত। তার আসা এবং নিঃশব্দে চলে যাওয়া দেখতাম আমি।

পরীখালা বড় ভালোবাসতেন এই টুনুমামাকে। তার হাসি-হাসি মুখে সে ভালোবাসা লেপ্টে থাকতো। একদিন, স্কুল থেকে ফিরে এসে দেখি, টুনুমামা খাচ্ছেন। পরীখালা বলছেন, আর একটু নাও। না খেয়ে খেয়ে শরীরটা তো শেষ করে দিয়েছ। তোমাকে নিয়ে যে কোথায় যাব।

আর একদিন, গভীর রাতে হঠাৎ জেগে দেখি, পরীখালা ঘরে নেই। ঘরের দরজা ভেজানো। আমি বেরুলাম, বাইরে ফুটফুটে জ্যোৎস্না। কামিনী ঝোপের আড়ালে চাঁদ, একা। দূর থেকে মনে হলো, পুকুরঘাটে কারা যেন খুব কাছাকাছি বসে আছে। খুব ধীরে ধীরে কাছে গিয়ে দেখি, পরীখালা। পাশে টুনুমামা! আমি নিঃশব্দে পেছনে দাঁড়ালাম, পরীখালা বলছে, আমার আর ভালো লাগছে না টুনু! খুব মন খারাপ লাগে আজকাল, আর পারি না। এই কথায় টুনুমামা পরীখালার গলা জড়িয়ে ধরলেন, মন খারাপ করে লাভ কী পরী?

টুনুমামার মাথার ওপর তখন নৃত্য করছিল জ্যোৎস্না। সেদিকে চোখ পড়তেই হাসি পেল আমার। সামান্য শব্দ হতেই টুনুমামা ভূত দেখার মতো চমকে উঠলেন, কে, কে?

কেউ নয় মামা, আমি রঞ্জু। তোমার সাহস দেখলাম।

কিছুক্ষণ পর ক্লান্ত পরীখালা ঘরে ফিরে এলেন। আমার শয্যাপাশে সেই প্রথম এক অগ্নিমূর্তি দেখলাম। চুল ধরে টেনে তুললো আমাকে। তারপর গরুপেটা করল। জ্বর নিয়ে আমি তিন দিন বিছানায় পড়ে থাকলাম, চুপচাপ। একা।

সেই থেকে আমার দুঃখের শুরু।

এক বয়সে টুনটুনিকে বড় ভালো লাগত আমার। ভারি ভালো মেয়ে ছিল আমাদের টুনটুনি। কৈশোরের ভালোলাগায় লাবণ্যের প্রয়োজন হয় না। ভালো লেগে যায়, তবু লাবণ্য ছিল এই টুনটুনির। দূর থেকে বোঝা যেতো না।

টুনটুনিকে আগলে রাখতেন টুনুমামা। একমাত্র মেয়ে। টুনুমামাকে বড় ভয় পেতাম। তবু মাঝে মাঝে টুনটুনির কাছে যেতাম আমি। বড় একা-একা থাকত। আমাকে দেখলে ওর কী যে আনন্দ হতো। নিচের ঠোঁটের সেই কাটা দাগটি আর চোখে পড়ত না তখন।

গত দু'দিন আসোনি কেন? মুখ ভার করে থাকতো ও। অভিমান।

কখনো ঈষৎ বাঁকা হাতটি দিয়ে জড়িয়ে ধরত আমাকে। আমি ওর নিজের ঠোঁটের সেই কাটা দাগটির ওপর আঙুল ছোঁয়াতাম। ওর উজ্জ্বল হাসির বন্যায় ঐ অপ্রিয় সুন্দর কাটা দাগটি যেন নিছক খড়কুটোর মতো ভেসে যেত মুহূর্তে।

একদিন বিকেলের দিকে আমি গিয়েছি টুনুমামার বাড়ি। টুনুমামা ছিলেন না, টুনটুনি একা। বাইরে একটু একটু বৃষ্টি হচ্ছিল, আমার শরীর ভেজা, চুল-চোখ-মুখ সব। টুনটুনি প্রায় দৌড়ে এলো। একটা লাল শাড়ি পরা ছিল ওর। আঁচল দিয়ে মুখ মুছল আমার। আঁচলের কিছু লাল বুঝি লেগে থাকল আমার মুখে। আমাকে টেনে নিয়ে এল ঘরে। বাইরে তখন মুশলধারে বৃষ্টি।

ঐদিন, সারা-বিকেল-সন্ধ্যা আমরা বৃষ্টির জলে ভাসলাম-ডুবলাম; আবার ভাসলাম, আবার ডুবলাম। যখন উঠব দেখি, দরজা অন্ধকার করে একজন দাঁড়িয়ে–টুনুমামা।

সেই থেকে আমার ব্যর্থতার শুরু।

বাবাকে দেখলে আজকাল আমার সেই দুঃখ-কষ্ট আর ব্যর্থতার কথা মনে পড়ে। শৈশব-কৈশোরের স্মৃতি বড় মারাত্মক, নরম মাটিতে যেন দাগগুলো গেঁথে থাকে। বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে শক্ত হয় সেই মাটি কিন্তু দাগ থেকে যায়। সহজে ওঠে না। বাবারও কি তাই? বাবা কি এখনো ধরে রেখেছেন মায়ের কথা, পরীখালার কথা? জানি না।

ক'দিন ধরে শরীরটা খুব খারাপ যাচ্ছিল আমার। এমন অনেক সময় আসে যখন কিছুই ভালো লাগে না। কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না। ঘরেও বসে থাকতে চায় না মন। চার পাঁচ দিন বৃষ্টি গেল একটানা। এখন বেশ ঝরঝরে হয়েছে প্রকৃতি। গাছপালার সেই মন খারাপ করা ভাবটি নেই আর।

গতকাল বৃষ্টির মধ্যে টেলিফোন করেছিলেন মিসেস শাহেদ। বাইরে বৃষ্টি হচ্ছিল। বাতাসের সাথে বৃষ্টির ছাট এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ছিল জানালার শার্সিতে। আমি ভাবছিলাম বাবার কথা। জীবনের অপরাহ্নে নিঃসঙ্গতা চারদিক থেকে ঘিরে ধরেছে বাবাকে। আমি তাঁকে কতটুকু সঙ্গ দিতে পারি। সারাদিন তো বলতে গেলে–অফিসে থাকি। তবু রমিজটা আছে বলে রক্ষে। পরীখালা টুনুমামার সঙ্গে চলে গেল–সেই থেকে ভয়াবহ রকম একা, নিঃসঙ্গ আমার বাবা। সারাদিন বসে থাকেন বারান্দায়, রমিজকে এটা ওটা নিয়ে ধমক দেন। আমি বাসায় ফিরলেই অভিযোগ। বয়স বৃদ্ধির সাথে মানুষ ধীরে ধীরে শিশুর স্বভাব পেতে থাকে। বাবা পরিণত শিশু হয়ে যাচ্ছেন ক্রমশ।

মিসেস শাহেদ বলল, কী করছ?

কিছু না। বৃষ্টি দেখছি।

আসবে? একদম একা বসে আছি।

কেন, সাহেব কোথায়?

চট্টগ্রাম। ফিরবে চার দিন পর।

আমাকে যদি টেলিফোনে না পেতে?

অন্য কাউকে নিশ্চয়ই খুঁজতাম না।

তোমাদের বিশ্বাস কি?

বহুবচনে বললে জবাব দিচ্ছি না। আমাকে বললে বলছি–জল-স্বভাব যে আমাতে নেই, কৃষ্ণের তা ভালোই জানা আছে।

তা রাধা বিবি, ভর দুপুরে বৃষ্টির ভেতর এই যে টেলিফোন করা হচ্ছে–আমাকে না পেলে এরকম অন্য কাউকেও তো করতে পারতে।

না, প্রশ্নই ওঠে না।

কেন?

কারণ, তুমি তুমিই। যাক আসবে।

দেখি।

দেখি না, আসো। শেষবারের মতো।

শেষবারের মতো মানে?

চলে যাচ্ছি। খুব স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল মিসেস শাহেদ। কোথায়? আমি অবাক হয়ে জানতে চাইলাম।

বহু দূরে।

টেলিফোন রাখলো মিসেস শাহেদ।

বাসায় ফিরে দেখি, বাবা শুয়ে আছেন। তাঁর ঘরে ডিম লাইটের মৃদু আলো। আমি আমার ঘরের দিকে পা বাড়াতেই বাবা অনুচ্চস্বরে ডাকলেন, রঞ্জু ফিরলি?

হ্যাঁ বাবা। কিছু বলবে?

বাবার কাছ ঘেঁষে বসলাম আমি। মৃদু নীল মায়াবী আলোয় ছেয়ে আছে বাবার শরীর। বললেন, আর তো বেশিদিন নেই আমার। একটু গ্রামে যেতে চাই, নিয়ে যাবি?

গ্রামে গিয়ে কী করবে বাবা? সেখানে কিছু নেই। বিশখালির ভাঙনে সব গেছে। কাগজে ইরোশনের ছবি দেখনি?

তবু যাবো আমি। নিয়ে যাবি?

ঠিক আছে, যেও।

চারদিকে সোনালি পর্দার মতো দুলছে দুপুর। রোদের তেজ আছে বেশ। অফিস থেকে বেরিয়ে রিকশার জন্যে দাঁড়িয়ে আছি বহুক্ষণ। কাঁধের কাছ থেকে সিলকের রুমালের মতো স্পর্শ দিয়ে যায় জ্যৈষ্ঠের বাতাস। ফুটপাত জুড়ে লাইন দিয়ে সাজানো ফলের দোকান। একটা মৌ-মৌ গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে বাতাসে। মানুষের ভিড় চারপাশে। সবাই অপেক্ষা করছে - কেউ বাস, কেউবা রিকশার জন্য। এক একটা বাস আসছে আর হুড়মুড় করে ঝাঁপিয়ে পড়ছে অফিস ফেরত মানুষের ঝাঁক।

একবার একটি খালি স্কুটার দেখে চিৎকার করে উঠলাম। স্কুটারটা দূর থেকে হাত নাড়াল, যাবে না। মাঝবয়সি এক ভদ্রলোককে দেখলাম বাসের দিকে ছুটে যাচ্ছেন। সঙ্গে একটি কাপড়ের প্যাকেট। ভদ্রলোক প্রায় ধরে ফেলেছিলেন বাসের হ্যান্ডেল। কিন্তু না, ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলেন তিনি। আমার পাশে দাঁড়ালেন। ঘামে একেবারে লবজব অবস্থা। পাঞ্জাবি ঘামে ভিজে লেপ্টে আছে পিঠের সঙ্গে। ‘ধুস শালা’ বলে ভদ্রলোক বাম হাতের খবরের কাগজ দিয়ে বাতাস খেতে লাগলেন।

ঠিক তক্ষুণি এলো একটি ডাবল ডেকার, ভিড় একটু কম। লোকজন নামছে, উঠবার পথে প্রচণ্ড ভিড়। অনেক কষ্টে সৃষ্টে প্রায় স্থূলকায় এক মহিলাও নামলেন সঙ্গে দুটি বাচ্চা। ডাবল ডেকারটি একটা বিশ্রী শব্দ তুলে চলে গেল। হঠাৎ তাকিয়ে দেখি আমার পাশের সেই লবজব ভদ্রলোকটি নেই।

আমাকে পাশ কাটিয়ে পরপর কয়েকটি স্কুটারও গেল। দু’ একটি রিকশাও। অবশেষে একটি রিকশা পেলাম আমি। ভাগ্য। উঠতে যাবো এমন সময় কেউ খুব কাছ থেকে নাম ধরে ডাকল। তাকিয়ে দেখি, বাস থেকে নেমে আসা সেই মহিলা। অপলক তাকিয়ে আছে আমার দিকে।

রঞ্জু না। আমি চমকে উঠলাম। ঠোঁটের সেই কাটা দাগটির ওপর স্থির হয়ে গেল আমার দৃষ্টি। আমার চোখের সামনে টুনটুনি। কতদিন, কতো মাস, কত বছর পর। কেমন আছ?

টুনটুনি দেখছে আমাকে।

ভালো তুমি?

দেখতেই পারছ।

টুনটুনি ব্যাগ থেকে ছোট্ট রুমাল বের করে ঘাম মুছল।

তোমার বাচ্চা?

দুটি বাচ্চা টুনটুনির দু’পাশে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে ছিল।

হ্যাঁ, ইতু আর মিতু।

টুনটুনি বলল, তোমাকে এ সময় দেখব ভাবতেই পারিনি!

সেই কখন থেকে রিকশার জন্যে দাঁড়িয়ে আছি। চলো কোথাও বসি।

আমরা সামনে এগুতে থাকি। ছোট্ট বাচ্চাটির হাত ধরে টুনটুনি এগুচ্ছে নিঃশব্দে। বড়টি আমার পাশে পাশে হাঁটছে।

কোথায় থাকো তোমরা? আমি জানতে চাইলাম। কাছেই। যাবে?

আজ না; আরেক দিন। ঠিকানাটা দাও।

টুনটুনি ঠিকানা বলে, আমি মুখস্থ করে রাখি।

একটা রেস্তোরাঁর সামনে এসে দাঁড়াতেই বললাম, চলো একটু বসি।

না, বললো টুনটুনি, আজ তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে। ও পথ চেয়ে বসে থাকবে।

টুনটুনির কথায় আমি বড় ব্যথিত হলাম। তবু বললাম, একটু বসি।

আজ থাক। টুনটুনি বলল, তুমি বরং আমার একটু উপকার করো। ইতু-মিতুকে নিয়ে একটু দাঁড়াও। আমি আসছি।

টুনটুনি মিতু-ইতুকে রেখে ফুটপাত ধরে সামান্য এগিয়ে গিয়ে ফার্মেসিতে ঢুকে পড়ে। ফিরে আসে হাতে একগাদা ওষুধ নিয়ে। ঈষৎ বাঁকানো হাতটি ওষুধগুলো বুকের কাছে ধরে আছে। আবার ছোট্ট রুমাল বের করে মুখের ঘাম মুছল টুনটুনি।

তোমায় কষ্ট দিলাম। আজ যাই, তুমি আসবে একদিন।

কার জন্যে ওষুধ কিনলে?

ব্যথিত চোখ তুলে তাকাল টুনুটুনি। ধীরে ধীরে বলল, ওর অসুখ। ছ' মাস ধরে বিছানায় পড়ে আছে। যাই, কিছু মনে কোরো না।

আর দাঁড়াল না টুনটুনি।

আমি বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে টুনটুনির চলে যাওয়া দেখলাম।

জোয়ারের জলে ভরে গেছে চারদিক, ধানক্ষেতের ভাঙা আল দিয়ে গলগল করে ঘোলাজল ঢুকে পড়ছে খেতে। বাম পাশে বিশখালি। সেই চেহারা আর নেই। বেশ রোগাটে, ভরা জোয়ারেও স্পষ্ট দেখা যায়। ওপারে চর জেগেছে, এদিকটা ভাঙছে। স্রোত এদিকটায় তাই প্রবল।

নদীর কিনার ধরে ঈষৎ উঁচু রাস্তা। বহুদিন পর গ্রামে ফিরছি আমরা। সামনে বাবা, পেছনে রমিজ, মাঝখানে আমি। রমিজের হাতে বাবার জুতো, ব্যাগ চায়ের ফ্লাক্স, খাবার-টাবার। একটু জোরে পা চালান চাচা–পেছনে থেকে রমিজ বলে ওঠে। বাবা আকাশের দিকে তাকালেন, আমিও। কালো মেঘে ছেয়ে আছে পশ্চিম আকাশ। ঠাণ্ডা বাতাস শুরু হয়েছে উত্তর দিক থেকে। বাবা লম্বা-লম্বা পা ফেলে হাঁটছেন। তাঁর পাঞ্জাবির দু'কোণ উড়ছে বাতাসে।

আরো একটি বাঁক সামনে। তারপর আমাদের পুরনো বসতভিটা। এখন অবশ্য কোনো চিহ্ন নেই। আশপাশে যারা তখন বাস করত তারাও উঠে গেছে নদী ভাঙনের শুরুতে। যারা সক্ষম– নদীর কিনার থেকে দূরে লোকালয়ের ভেতরে নতুন বাড়ি তুলেছে।

বাতাসের বেগ বাড়ছে ক্রমশ। সেই সঙ্গে বৃষ্টিও। এতক্ষণ একটু একটু পড়ছিল। তবে হাঁটতে অসুবিধা হয়নি। বাবা দু'একবার অসাবধানে হাঁটতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে তারপর হিসেব করে করে পা দিচ্ছিলেন। কিন্তু হঠাৎ বৃষ্টি-বাতাসের দাপটে বাবা আবার দ্রুত পা চালালেন, আমরাও। আকাশে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল ঘনঘন। কোথাও প্রচণ্ড শব্দে বাজ পড়ল। বুক কেঁপে উঠল আমার।

একটা বিশাল গাছের নিচে আশ্রয় নিলাম আমরা। সবাই ভিজে একাকার, বাবার পাজামা-পাঞ্জাবি শরীরের সঙ্গে লেপ্টে আছে। এত মেঘ-বৃষ্টি কোত্থেকে এল হঠাৎ। সহজে থামবে বলেও মনে হচ্ছে না। বিশাখালির ঢেউ ভেঙে পড়ছে দু'পাড়ে। ক্রুদ্ধ আক্রমণের ভঙ্গিতে একটার পর একটা ঢেউ এসে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। বাবা হঠাৎ বললেন–রঞ্জু, তোর মাকে মনে পড়ে? আমি বাবার দিকে তাকালাম। তার ভেতরটা ওপর থেকে কতটুকু আর চোখে পড়ছে! পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালাম।

তারপর বললাম–কখনো কখনো মনে পড়ে। তোমার মনে পড়ে না বাবা?

কোথাও সশব্দে বাজ পড়ল আবার। রমিজ লাফিয়ে ওঠে, ভয়ে। আমার প্রশ্নের জবাব দিলেন না বাবা। রমিজের দিকে তাকিয়ে বললেন, চলো এগোই। রমিজ বললো, ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে আর এগোনো যাবে না চাচা। মরে যাব। ধমকে উঠলেন বাবা, বললেন, মরবি না। মানুষ সহজে মরে না।

বাবা আবার হাঁটতে লাগলেন।

বাঁক ঘুরতেই খালি-খালি জনমানবহীন, পরিচিত পটভূমিতে চোখে পড়ল সেই বাদাম গাছটি। নদীর দিকে নূয়ে আছে, জোয়ারের জল উঠে এসেছে গাছটির মাঝামাঝি। মাকে কবর দেয়া হয়েছিল ঐ গাছটির পাশেই। বিশখালির ভাঙন গ্রাস করেছে সবকিছু।

প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টির ভেতর খুব দ্রুত পা চালাচ্ছেন বাবা; তাঁকে পেছন থেকে চিৎকার করে ডাকছি আমরা। বাবা শুনছেন না, ক্ষ্যাপার মতো এগিয়ে যাচ্ছেন। আমরা যতই ঝড়-বৃষ্টি অতিক্রম করে বাবার কাছে আসছি, বাবা ততই দূরে সরে যাচ্ছেন। আমি আর হাঁটতে পারছি না। রমিজ বসে গেছে মাটিতে। আমার পায়ের কয়েক জায়গা ছিঁড়ে গেছে, ব্যথা। তবু চিৎকার করে ডাকছি তাঁকে। বাতাসের সাথে, মেঘের গর্জন আর নদীর ঢেউয়ের সাথে মিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে আমার চিৎকার।

ক্লান্ত, অবসন্ন আমি ঝড়-বৃষ্টির ভেতর আরো কিছুদূর এগিয়ে এসে দেখি, সেই বাদাম গাছটির পাশ দিয়ে বাবা নিশ্চিন্তে বিশখালিতে নেমে যাচ্ছেন।

Rvnvbviv Lvb exYv

লীলাবতী

ব্যাঙ্ককের ফ্লাইট সকাল সোয়া ন'টায়। তাহলেও খুব সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে পড়তে হলো। গেল রাতে তেমন ঘুম হয়নি। আসলে ঘুমের জন্য সময় পাওয়া যায়নি। সন্ধে থেকে মধ্যরাত অবধি পরিচিত লোকজন, বন্ধু-বান্ধব আর আত্মীয়-স্বজনের ভীড়ে ভর্তি ছিল রুম নাম্বার দুই শ' তিন। সবাই চলে যাবার পরে যাত্রার প্রস্তুতি সম্পন্ন করতে করতেও রাত প্রায় শেষ। ক্যাপ্টেন রাশাদ বলেছিলেন সকাল সাতটার মধ্যে এয়ারপোর্টের উদ্দেশ্যে রওনা দিতে হবে।

এখন ঘড়িতে সকাল পৌণে সাতটা। খুব দ্রুত তৈরি হয়ে নিতে হলো। এই একটু পরে আপুকে নিয়ে ব্যাঙ্ককে যাচ্ছে শিমুল, সঙ্গে দুলাভাই, ক্যাপ্টেন রাশাদ এবং আরো দু'জন অ্যাটেন্ডেন্ট। আজ দু'মাস আট দিন ঘুমিয়ে আছেন আপু, একটানা, ধানমন্ডির একটি ক্লিনিকে। গত একটি বছর ধরেই আপু অসুস্থ, কখনো ভালো কখনো খারাপ। এখানকার ডাক্তাররা কিছুই ধরতে পারছেন না। ট্রিটমেন্টের ব্যবস্থা দেখে বুঝতে পেরেছে শিমুল, নতুন করে আর কিছু ধরতে পারার সম্ভাবনাও তেমন নেই। এখানে আসার পর থেকে আর সবার মতো ওর মনটা যতখানি খারাপ তার চেয়ে বেশি খারাপ হয়ে আছে ওর মেজাজ।

ঢাকায় এসে আপুর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে স্তব্ধ হয়েছিল শিমুল সারাটা দিন। দূর থেকে গত ৩ মাসে ঢাকার সঙ্গে অসংখ্যবার কথা হয়েছে ফোনে, কিন্তু আপু যে এতোখানি অসুস্থ ও তা ভাবতেও পারেনি। একটি বাচ্চা মেয়ের মতো বিছানায় শুয়ে আছেন আপু, দুটো চোখই বন্ধ। মোমের মতো সাদা গায়ের রঙ এখন পোড়া বেগুনের মতো। নাকে মুখে টিউব। কান্নায় ভেঙে পড়েছিল শিমুল। মনে হয়েছিল আপুকে কোলে তুলে নিয়ে তখনি ফিরে যায় ও মেপেল গাছে ছাওয়া রচেস্টারের ওর বিশাল সুন্দর বাড়িটিতে। যদিও এই অবস্থায় রচেস্টার, নিউইর্য়কের দূরত্ব আপুর জন্য অনেক বেশী। দুলাভাই যখন বললেন, একটি মৃত মানুষকে নিয়ে তুই কোথায় যেতে চাস? শিমুল তখন পরিপূর্ণ দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে ছিল দুলাভাইয়ের চোখের দিকে। বলেছিল, এটি আমার চ্যালেঞ্জ দুলাভাই, আমি আপুকে নিয়ে অন্তত একবার ব্যাঙ্ককে যেতে চাই শেষ চেষ্টা হিসেবে। সেই মুহূর্তে শিমুলের মুখটা কেমন যেন কঠিন হয়ে উঠেছিল।

ব্যাঙ্কক এয়ারপোর্টে নামতেই শিমুল দেখল আপুর জন্য 'Bumrungrad' হসপিটালের একটি মোবাইল ইনটেনসিভ কেয়ার দাঁড়িয়ে আছে আর তার সঙ্গে শিমুলদের জন্য অন্য আরেকটি ভ্যান, মুহূর্তের মধ্যে মোবাইল ইনটেনসিভ কেয়ারটি আপুকে নিয়ে শাঁ-শাঁ গতিতে ছুটে চলল ব্যাঙ্ককের হাইওয়ে ধরে আর তার সঙ্গে সঙ্গে শিমুলদের ভ্যানটিও। এই সবকিছু ব্যবস্থাই ঢাকায় বসে ওরা ফোন আর ই-মেইল এ সেরে রেখেছিল। ব্যাঙ্ককের হাইওয়ে ধরে যেতে যেতে দু'দিকে তাকায় শিমুল। এই নিয়ে ওর চারবার ব্যাঙ্ককে আসা। তারপরেও যতবার আসে ততবারই নতুন নতুন লাগে। কেন জানি না, তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলোর মতো থাইল্যান্ডও শিমুলকে খুব টানে। আজ ব্যাঙ্ককের আবহাওয়া মোটামুটিভাবে খারাপই বলা যায়, আকাশ অন্ধকার হয়ে আছে। ঠিক যেন বাংলাদেশের শ্রাবণের আকাশ, সারাটা পথ ঝিরঝিরে বৃষ্টি দেখতে দেখতেই ওরা পৌঁছে গেল হসপিটালে। ক্যাপ্টেন রাশাদ বললেন, আপনি কি আপনার আমেরিকান

পাসপোর্টটি আমার কাছে রাখতে দেবেন, নাকি আপনিই আমাদেরগুলো রাখবেন? রাশাদের হাসি দেখে শিমুলও হেসে ফ্যালে, বলে, আপনি রাখলেই তো ভালো ।

বিকেলের মুখে মুখে হসপিটালের দশ তলার লবিতে চুপচাপ বসে আছে শিমুল । বাইরে কাঁচের দেয়ালের ওপাশে ব্যাঙ্কক শহর । উঁচু উঁচু দালানকোঠা, তার উপরে ঘন কালো মেঘলা আকাশ, দূরের হাইওয়ে ধরে ছুটে যাওয়া যানবাহন এই সবকিছু দেখতে দেখতে শিমুলের দু'চোখ জলে ভরে উঠল । আজ দু'সপ্তাহের বেশি ওরা আপুকে নিয়ে ব্যাঙ্ককের Bumrungrad হসপিটালে এসেছে । এখানে আসার সাথে সাথে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরে আপুর অসুস্থতার কারণ খুঁজে পাওয়া গ্যাছে এবং তার ট্রিটমেন্টও শুরু হয়েছে । দু'মাসের বেশি ঘুমিয়ে থাকার পরে আপু চোখ মেলেছেন, হাত পা নেড়েছেন, কথা বলেছেন । শিমুলকে দেখে খুশিতে ঝলমলে হয়ে উঠেছেন । শিমুলও কী রকম একটি জয়ের আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠেছিল । কিন্তু গতকাল থেকে ও ক্রমশঃ বুঝতে পারছে আপুর কথাগুলো বেশিরভাগই অসংলগ্ন, প্রলাপ! তবে কি শিমুলের এই প্রচেষ্টা সফল হবে না? দু'হাতের তালুতে মুখ ঢেকে কেঁদে ফেলে ও । মা নেই, আপুই তো ওর মায়ের বিকল্প!

– আপনার মন খারাপ?

চমকে ওঠে শিমুল । ক্যাপ্টেন রাশাদ কখন ওর পাশে এসে বসেছেন টের পায়নি ও ।

– চলুন, আপনাকে চমৎকার একটি জায়গায় নিয়ে যাচ্ছি । দেখবেন, চলুন । রাশাদের গলায় কী ছিল । উঠে দাড়ায় শিমুল । রাশাদের সঙ্গে শিমুলের পরিচয় আজ তিন চার বছর । দুলাভাইয়ের কোম্পানির একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং দুলাভাইয়ের পারিবারিক বন্ধু হিসেবেই তার পরিচয় । যখনি শিমুল ঢাকায় এসেছে তখনি মাঝে মাঝে রাশাদের সঙ্গে দেখা হয়েছে । কিন্তু এবারে অন্য রকম । এবারে ওরা ঢাকা থেকে একসঙ্গে ব্যাঙ্ককে এসেছে আপুর ট্রিটমেন্টের জন্য ।

– চলুন, কোথায় নিয়ে যাবেন, চলুন, উঠে দাড়ায় শিমুল ।

এলিভেটরে করে হসপিটালের ছয় তলায় নেমে আসে ওরা । কাঁচের বিশাল দরজা ঠেলে বাইরে বেরিয়ে আসতেই চেঁচিয়ে ওঠে শিমুল ।

– বাহ্ ভারি সুন্দর তো! লম্বা টানা ফুলের বাগানটায় দাঁড়িয়ে আবার চেঁচিয়ে ওঠে শিমুল ।

– আপনি এতো চমৎকার বাগানটির সন্ধান কী করে পেলেন? সত্যিই চমৎকার সুন্দর একটি বাগান । অসংখ্য ফুলের গাছ । প্রায় প্রতিটি গাছেই থোকা থোকা ফুল ফুটে আছে । বাগানের ঠিক মাঝখানে একটি জলের ফোয়ারা, ঝরঝর শব্দে জল ঝরিয়ে যাছে । লম্বা বাগানের ফাঁকে ফাঁকে ছোট ছোট খোলা কুঁড়েঘর, প্রতিটি ঘরের ভিতরে বেঞ্চ পাতা, কুঁড়েঘরগুলোর পাশ দিয়ে চলে যাওয়া ইট বিছানো সরু পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ থমকে দাঁড়ায় শিমুল ।

ফুলে ফুলে ভরা বিশাল একটি গাছ থেকে ঝুর ঝুর করে ঝরে পড়ছে ফুল ।

– আচ্ছা এটা কি ফুল?

– নাগ কেশর ।

– নাগ কেশর? বিস্মিত হলো ও, তারপর দ্রুত ঝ'রে যাওয়া ফুলগুলো যতটা পারল কুঁড়িয়ে নিল । এই মুহূর্তে ওর মনে পড়ল কমল কুমার মজুমদারের 'গোলাপ সুন্দরী' বইটির কথা । সেই স্যানেটোরিয়াম, সেই অসুস্থ, মৃত্যুপথযাত্রী মানব-মানবী দু'জনের কথা । রাশাদ বলল, আপনি কিছু ভাবছেন? শিমুল বলল, নাগ শব্দটা এইকরম সুন্দর একটি ফুলের সঙ্গে ঠিক মানায় না, তাই না?

– মানে?

– না, মানে ইতস্তত: করে শিমুল । তারপর হঠাৎ অদূরে দাঁড়ানো থাই নার্সটির দিকে তাকিয়ে বলে, রাশাদ আপনি একটু দাঁড়ান । আমি ঐ মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করে আসি, ওদের ল্যাংগোয়েজে এই সুন্দর ফুলটিকে ওরা কি নামে ডাকে । শিমুলের ছেলেমানুষিতে রাশাদও কিছুটা ছেলেমানুষ হয়ে ওঠে । বলে, করুন করুন, এখুনি

জিজ্ঞেস করুন। ছুটে যায় শিমুল মেয়েটির কাছে। রাশাদ দেখে সত্যি সত্যি শিমুল মেয়েটিকে কী যেন জিজ্ঞেস করছে। তারপর হঠাৎ শিমুল চিৎকার করে ওঠে।

– রাশাদ, লীলাবতী।

ও-মা কি সুন্দর নাম, লীলাবতী, রাশাদের কাছে এসে দাঁড়ায় ও। তারপর খুব নরম গলায় বলে,

– এমন একটি সুন্দর জায়গায় নিয়ে আসার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ।

শিমুলের মুখের দিকে তাকায় রাশাদ, তারপর কী রকম গাঢ় গলায় বলে,

– আপনাকেও ধন্যবাদ লীলাবতী!

গতরাতে খুব ঝড়বৃষ্টি হয়ে গ্যাছে। বিছানায় শুয়ে শুয়েই টের পেয়েছে শিমুল। আজ দু'মাসেরও বেশি ওরা এখানে। রচেস্টার থেকে আসার পরে একরাতও শিমুল ভালভাবে ঘুমাতে পারেনি। আপু রাতের বেশির ভাগ সময়ই জেগে থাকেন। কখনো সুন্দর সুন্দর কথা বলেন, কখনো আবোল-তাবোল, সবকিছু মিলিয়ে শিমুলের মনটা একেবারেই ভালো নেই। হঠাৎ মনে হলো রাশাদের কথা, শিমুল বুঝতে পারছে গত ক'টি ঘণ্টা ধরে রাশাদ ওকে কেমন এড়িয়ে চলছে। গত দু'টি মাস দিনের প্রায় প্রতিটি মুহূর্তে ওরা একসঙ্গে থেকেছে। কখনো ডাক্তারদের সঙ্গে, কখনো ডায়ালাইসিস সেন্টারে, কখনো ব্যাংকে, কখনো খাবার দোকানে, কখনো লবিতে। গতকাল বিকেলে বলেছিল,

– আপনি আমার সাথে একটু এম.বি.কে. তে যাবেন।

এম.বি.কে., ব্যাঙ্ককের একটি বড় মল। শিমুল মাথা নেড়েছিল। বলেছিল যাবে। কিন্তু এরপর রাশাদ ওর সঙ্গে আর যোগাযোগ করেনি।

শিমুলের মনে আছে, ঢাকায় কিডনি হসপিটালে বসে রাশাদ ওকে জিজ্ঞেস করেছিল,

– আপনি তো একজন স্বাধীন মানুষ, তাহলে,

– স্বাধীন মানুষ মানে? রাশাদকে শেষ করতে দেয়নি শিমুল। তার আগেই চেঁচিয়ে উঠেছে।

– না, মানে, আপনাকে গত ক'বছর ধরে দেখছি আপনি প্রতি বছর ঢাকায় আসেন। এবং একা আসেন। আপনার মধ্যে কেমন একটা মুক্ত মুক্ত ভাব আছে – কিন্তু আপনার কবিতা কেন বলে আপনি মুক্ত নন? কিসের কষ্ট আপনার?

রাশাদের কথার আক্রমণে শিমুলের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিটা ক্রমশ: নত হয়ে আসে। তারপর কি রকম একটা উদাসী গলায় বলে,

– প্রত্যেকটি মানুষেরই তো কিছু দুঃখ, কিছু বেদনা, কিছু কষ্ট থাকে। আমিও তো মানুষ, আমিই বা এর বাইরে কেন থাকব? আর যদি সত্যিই জানতে চান আমার কিসের কষ্ট তবে বলব আমার আবদ্ধতাই আমার কষ্ট।

গত দুপুরে ওরা গিয়েছিল হসপিটালের উইকলি বিল মেটাতে একাউন্টস অফিসে। নয় তলার লবিতে বসে কফি খেতে খেতে রাশাদ আবার বলছিল,

– আপনার প্রতিটি কবিতায় আপনি একজন কাউকে খুঁজে বেড়ান, যাকে আপনি পাননি। কেন পাননি? কে সে?

উত্তরে মৃদু হেসেছিল শিমুল। মনে মনে ভাবছিল,

ও নিজেই কি জানে, কে সে?

ভোরে ঘুম ভাঙতেই চমকে যায় শিমুল। লীলাবতী! এক থোকা সাদা ধবধবে লীলাবতী ওর মাথার কাছে। অন্ধকার করে রাখা ঘরের ভেতরে হালকা একটা মিষ্টি গন্ধ মিশে কি রকম একটা মায়াবী পরিবেশ তৈরি করে

রেখেছে। বুকের ভেতরটা কেমন করে ওঠে ওর। মুখ হাত ধুয়ে কফির কাপ হাতে লবিতে গিয়ে বসে শিমুল। বাইরে এখন আর বৃষ্টি নেই। ঝকঝকে রোদে ভেসে যাচ্ছে সমস্ত ব্যাঙ্কক শহর। আরো কতদিন, কতমাস থাকতে হবে এখানে, এখনো বুঝতে পারছে না শিমুল। এই মুহূর্তে অনেক কিছু ভাবছিল ও। রচেস্টার, রচেস্টারে রেখে আসা ওর জীবন আপু, দুলাভাই, রাশাদ! হঠাৎ নার্স স্টেশনের নার্স ওয়ার্পনা এসে বললো,

– তোমার ফোন।

অবাক হলো শিমুল। নার্স স্টেশনে ওর ফোন? হ্যালো বলতেই ও পাশ থেকে রাশাদের গলা ভেসে এল।

– সুপ্রভাত, লীলাবতী!

– সুপ্রভাত! চমকালো শিমুল।

– আজ বিকেলের ফ্লাইটে ফিরে যাচ্ছি ঢাকায়।

– কেন? আজ বিকেলে কেন?

– এখানে আমাকে যতখানি প্রয়োজন ছিল, আশা করি ততখানি আমি সম্পন্ন করতে পেরেছি। আর তো আমাকে প্রয়োজন নেই!

– আমাকে একা ফেলে চলে যাচ্ছেন?

– একা কোথায়? এই যে Sukumvit শহরের SOI নাম্বার এক , SOI নাম্বার দুই, SOI নাম্বার তিন, কিছু বৃষ্টির বিকেল, কিছু জানা গল্প, কিছু অজানা গল্পতো রেখে গেলাম আপনার জন্য। এ ছাড়া আপনার দুলাভাই এবং এ্যাটেন্ডেন্টরাও তো রইল!

– রাশাদ! দু'চোখ জ্বালা করে ওঠে শিমুলের ।আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন না?

– না, লীলাবতী।

– আমাকে আপনার দেখতে ইচ্ছে করছে না?

– করছে। এবং করছে বলেই ফিরে যাচ্ছি।

– মানে?

– আপনি, অতলান্তিকের ওপার থেকে উড়ে আসা আশ্চর্য এক মেঘ পরী, আমার মধ্যে যে এত অপূর্ণতা ছিল, আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে বুঝতে পারিনি।

আমার অপূর্ণতাকে কখন যে আপনি একটু একটু করে পূর্ণ করে দিয়েছেন, তাও বুঝতে পারিনি, আমি জানি, আর ক'দিন পরেই আপনি আবার উড়ে চলে যাবেন।

রাশাদের কোন কথাই শিমুলের কানে আসছিল না। রাশাদ বলল,

– লীলাবতী, আপনি জানেন না, আমি কোথায় কোথায় না আপনাকে খুঁজেছি। সুয়েজের তীরে তীরে, পোর্ট সৈয়দের জনপদে, নেপলসের পথে পথে, এমনকি মধ্যরাতে ভেসে চলা জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে আকাশের নক্ষত্রদের মধ্যেও আমি আপনাকে খুঁজে বেড়িয়েছি। অথচ কি আশ্চর্য, শেষ পর্যন্ত খুঁজে পেলাম ব্যাঙ্ককের এই Sukumvit শহরে!

ফোনের এপাশে শিমুলের দু'চোখ থেকে ঝর ঝর করে গড়িয়ে পড়ে জল। বলে,

– রাশাদ আপনার মনে পড়ে আমার সেই কবিতা?

– কোন কবিতা?

– সেই যে,

'Those sailor - blue eyes
Which turn into pain
and make my heart
an ocean of pain!

O Sailor,
How far would you sail
against the waves of pain
how far?'

লীলাবতী আমার সব মনে পড়ে। আপনার ওই কবিতার মতোই, আমি আবার ফিরে যাব আমার ফেলে আসা সেই নাবিক জীবনে। আবার আমি ঘুরে বেড়াব বন্দর থেকে বন্দরে। দেশ থেকে দেশান্তরে।